মার্চ ২০২৩ ▪ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস

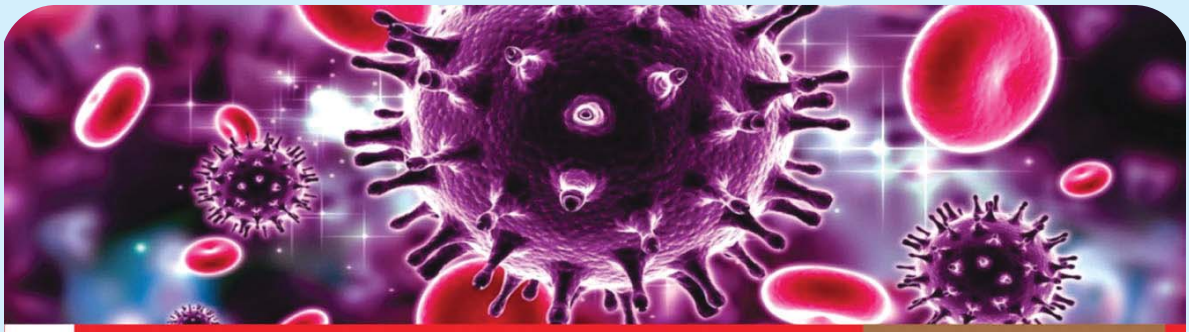

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২৩ ⊔ ফাল্গুন–চৈত্র ১৪২৯

DECLARATION OF INDEPENDENCE

BY

THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman
26 March, 1971"

Source: THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH [Printed with latest amendment, April, 2016], Sixth Schedule [Article150(2)], Page-177

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১"

সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬], ষষ্ঠ তফসিল [১৫০(২) অনুচ্ছেদ], পৃষ্ঠা-১৫২

সম্পাদকীয়

মার্চ মাস বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার সুনিপুণ কারিগর, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের শোষণ-নিপীড়ন চালিয়ে আসছিলো। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালিদের বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছিল। বঙ্গবন্ধু এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার ও প্রতিবাদী। বাঙালির অধিকার আদায়ে তিনি লাগাতার সংগ্রাম করেছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনা শানিত করার সাথে সাথে বাঙালির অধিকার আদায়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন। স্বাধিকার থেকে স্বায়ত্তশাসন এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি রূপ দেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেন। বাঙালির বিজয় মেনে নিতে না পেরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলার' নির্দেশনা দিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ভয়াল কালরাত্রিতে শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম ও বর্বরতম গণহত্যা পরিচালনা করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণায় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এই ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতি এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় মহান বিজয়। আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের অগণিত বীর শহীদকে। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মা-বোনকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা ও গল্প। এছাড়া নিয়মিত বিভাগ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যা। আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* মার্চ ২০২৩ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

গৌরবের মার্চ মাস এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের এগিয়ে যাওয়া ৪
ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধুর ব্রত দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ৭
মোনায়েম সরকার

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ ৯
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

মুজিবনগর সরকারের তথ্যপত্র ও দলিল সমীক্ষা ১৩
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

ঢাকার সংবাদপত্রে ১৯৭১ উত্তাল মার্চের জনমতের চিত্র ১৫
ড. মো. এমরান জাহান

৭ই মার্চের ভাষণ ও বেতারে সম্প্রচারের অন্তরালে ১৮
প্রফেসর ড. মো. নাজমুল হক

অমিয় 'অগ্নি-উগারী বান' ২১
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

'স্বাধীনতার ঘোষণা' যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময় ২৪
নাসরীন মুস্তাফা

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস: প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ২৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক ২৯
ড. মো. আব্দুস সামাদ

আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার বাংলাদেশ ৩২
ড. শিহাব শাহরিয়ার

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১ ৩৫
অদিতি চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু: ছড়া-কবিতায় ৩৭
দেলওয়ার বিন রশিদ

বঙ্গবন্ধু ও নারীসমাজ ৪০
তানজিনা চৌধুরী

অপারেশন সার্চলাইট নারকীয় গণহত্যা ৪২
সুষমা ফাল্গুনী

জাতীয় পতাকা আমাদের অহংকার ৪৪
প্রশান্ত দে

ভোক্তা অধিকার দিবস: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৪৬
সুরাইয়া ইসলাম

গল্প

মুরগিছানা চিকেনচি ৪৭
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ

৫০-৫৩
মুহম্মদ নূরুল হুদা, দুখু বাঙাল, সোহরাব পাশা শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, আবুল হোসেন আজাদ দেবকী মল্লিক, বাবুল তালুকদার, ইজামুল হক মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ, সোহেল বীর, আবীর আহাম্মদ উল্যাহ, সানোয়ার রাসেল

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫৪
প্রধানমন্ত্রী ৫৫
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৬
শিক্ষা ৫৭
উন্নয়ন ৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৯
অর্থনীতি ৬০
নারী ৬০
কৃষি ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬১
সামাজিক নিরাপত্তা ৬২
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬২
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
না ফেরার দেশে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর আমির হোসেন মালিতা ৬৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতেই উত্তাল হয়ে ওঠে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ে তাঁর দূরদর্শিতায় সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবিলার ডাক দিলেন। এ ভাষণটি স্বাধীনতাকামী মানুষের অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনার চিরন্তন উৎসও। '৭ই মার্চের ভাষণ ও বেতারে সম্প্রচারের অন্তরালে' ও 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– ১৯ ও ২৯

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন এবং সমগ্র জীবন ছিল আদর্শ ও অনুকরণীয়। তিনি সমগ্র জীবনকাল দেশ ও দেশের জনগণের জন্য ভেবেছেন, অন্যায় ও জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তিনি বাংলার অধিকার আদায়ে পরিণত হলেন 'বঙ্গবন্ধু'তে। অমিত সাহসী বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন ন্যায় ও অধিকারের পক্ষে সোচ্চার, পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির মুক্তির দিশারি ও অবিসংবাদিত নেতা। ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। তাঁর জন্মদিন নিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর ব্রত দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো' ও 'অমিয় অগ্নি-উগারী বান', 'বঙ্গবন্ধু: ছড়া-কবিতায়' এবং 'বঙ্গবন্ধু ও নারীসমাজ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– ৭, ২১, ৩৭ ও ৪০

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের করণীয় বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন-ই বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। বাঙালির স্বাধীনভূমি 'বাংলাদেশ' এসেছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে। ইতিহাসে মার্চ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য। ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস নিয়ে 'গৌরবের মার্চ মাস এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের এগিয়ে যাওয়া', 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ', 'মুজিবনগর সরকারের তথ্যপত্র ও দলিল সমীক্ষা', 'ঢাকার সংবাদপত্রে ১৯৭১ উত্তাল মার্চের জনমতের চিত্র', 'স্বাধীনতার ঘোষণা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়' এবং 'আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– ৪, ৯, ১৩, ১৫, ২৪ ও ৩২

গৌরবের মার্চ মাস এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের এগিয়ে যাওয়া

ড. আতিউর রহমান

মার্চ মাস– আমাদের আত্মত্যাগ ও গৌরবের মাস। বেদনা ও আনন্দের মাস। শক্তি ও সাহসের মাস। বঙ্গবন্ধু মুক্তি ও স্বাধীনতার ডাক দেন এই মাসেই। অসহযোগ আন্দোলনের হাত ধরে বাঙালি স্বশাসনের স্বাদ পেয়েছিল এ মাসেই। বঙ্গবন্ধু পুরো জনগোষ্ঠীকে একটি অখণ্ড জাতিতে রূপান্তর করেন এই বিক্ষুব্ধ মার্চেই। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের অসামান্য ভাষণের পর গেরিলা যুদ্ধের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায় বাংলাদেশের তরুণরা। তাই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ডাক পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকুতোভয় বাঙালি তরুণেরা। সাধারণ ঘরের এই ছেলেমেয়েরাই স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তথা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে নেমে পড়ে বাংলাদেশের সকল প্রান্তে। উল্লেখ্য, এদের আটাত্তর শতাংশই ছিল কৃষক সন্তান। বাদবাকিরা শহর থেকে আসা মধ্যবিত্তের সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহনেতারা। তাঁরা ছিলেন সকলেই গ্রাম থেকে শিক্ষার সন্ধানে নগরে আসা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ও পাটাতনে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে চিন্তা-চেতনার এতটা মিল। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর এক গবেষণায় দেখেছি তাঁরা বয়সে খুবই নবীন। গড় বয়স ছিল– মাত্র বাইশ-তেইশ বছর। প্রশ্ন করেছিলাম– তাঁরা কেন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন? তাঁদের বেশির ভাগেরই উত্তর ছিল স্বাধীনতা অর্জনের বাসনা। তাছাড়া তাঁরা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তাঁদের মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছিল। আর স্বপ্ন ছিল কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষা করে শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশে পরিণত করা।

তাঁদের এই স্বপ্নের সাথে ঠিকই মিল খুঁজে পাই বন্দি জীবন থেকে মুক্ত জাতির পিতার কথায়। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি তিনি লন্ডন পৌঁছেন। ঐ দিন লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' এর দুদিন পর ১০ই জানুয়ারি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে নেমেই তিনি উচ্চারণ করেন, 'এই অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশ থেকে আশায়। ... আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের বিজয়ী হাসি রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে।' এরপর ঢাকা বিমানবন্দর থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে না গিয়ে তিনি সরাসরি চলে যান রেসকোর্স ময়দানে। মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি থেকে ফিরে আসা বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে কীভাবে গড়ে তুলবেন সেই সব কথা বলতে থাকেন। 'আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। ... আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।' কী দূরদর্শী ছিল তাঁর সেদিনের ঐ উচ্চারণ!

এর পর পরই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি স্বদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়েন। রাতদিন পরিশ্রম করেন। সোনার বাংলার যে স্বপ্ন তাঁকে আজীবন তাড়া করত সেই স্বপ্নের ছোঁয়া পান দেশবাসী ২৬শে মার্চ ১৯৭২। প্রথম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, 'আজ আমি যখন সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী, আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের সরকার যদি এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তাহলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। ... আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

বাঙালির সুখ ও শান্তির জন্যে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করেছেন। তাই মাত্র সাড়ে তিন বছরেই সকল বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করে একটি স্থিতিশীল সমাজ ও অর্থনীতি বিনির্মাণে তিনি অনেকটা পথই পাড়ি দিয়েছিলেন। দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র, বাংলাদেশ এক 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য, ম্যালথাসের ভঙ্গুর তত্ত্বের প্রতীক ব্যর্থ রাষ্ট্রের দুর্নাম ঘুচিয়ে, বৈরী প্রকৃতি ও দুর্ভিক্ষ শক্তহাতে মোকাবিলা করে তিনি সুজলা সুফলা বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তাঁর আমলের শেষ বর্ষে প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। পঁচাত্তরে আমনের ফলন বাম্পার হবার কথা। ষড়যন্ত্রকারীরা এ সুযোগ তাঁকে দেয়নি। হঠাৎ করে রাতের অন্ধকারে হামলা করে দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁকে শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।

সৌভাগ্য আমাদের এই যে, দীর্ঘ একুশ বছরের সংগ্রাম ও আন্দোলন শেষে ১৯৯৬ সালে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার। দ্রুতই ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ। সুদৃঢ়

হাতে আটানব্বইয়ের মহাবন্যা মোকাবিলা করে তিনি দেশবাসীর গভীর আস্থা অর্জন করেন। একজন বন্যার্তকেও না খেয়ে মরতে দেননি। কিন্তু দেশ যখন স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে, ফের ২০০১ সালে ঘটে ছন্দপতন। আবার ষড়যন্ত্র। আবার স্বদেশ হাঁটতে থাকে 'অদ্ভুত এক উটের পিঠে'। এর পরের সংগ্রাম ও আন্দোলন, সামরিক হস্তক্ষেপ, জেল-জুলুমের কথা আমরা সবাই জানি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা ফিরে আসেন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে। এরপর আরও দুবার লাগাতার তিনি ক্ষমতায় এসেছেন। সরকারের ধারাবাহিকতার সুযোগ পেয়ে তিনি স্বদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় নিরন্তর নয়া নয়া মাইলফলক যোগ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে পদ্মা সেতুসহ বড়ো বড়ো অবকাঠামো নির্মাণে এসেছে দারুণ গতি। এসবের প্রভাবে অর্থনীতি রয়েছে চাঙা।

সবারই জানা আছে, করোনা অভিঘাত আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু সবকিছুই সামাল দিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু এই নয়, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ধেয়ে আসা মন্দা মোকাবিলায় বাংলাদেশের বিচক্ষণ নেতৃত্বে সময়োচিত সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নেবার সুসাহস দেখিয়েছেন। আর সেসব সিদ্ধান্তের মূলে ছিল আমাদের স্বদেশি উন্নয়ন নীতি-কৌশলের শক্তিময়তা। একইসঙ্গে আমরা বাইরের উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা নিতেও কার্পণ্য করিনি। ঘরে-বাইরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চলমান সংকট মোকাবিলা করেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে আইএমএফ কর্মসূচিতে অংশ নিতে সম্মত হয়েছে। সম্প্রতি আইএমএফ-এর বোর্ডে বাংলাদেশের জন্য ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাস হয়েছে। অন্য অনেক দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের একেবারে বাইরে চলে যায়, তখনই কেবল সরকারগুলো আইএমএফ-এর দ্বারস্থ হয়। আমাদের নীতি-নির্ধারকেরা বিদ্যমান বাস্তবতার বিষয়ে সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে আগেভাগেই আইএমএফ-এর সঙ্গে ঋণ কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন বলেই আইএমএফ যথাসময়ে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তকে খুবই সময়োচিত বলে প্রশংসা করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ, বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। বাংলাদেশের পরম সুহৃদ এই অর্থনীতিবিদ আমাদের সংকট মোকাবিলার জন্য আগাম চিন্তার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। আইএমএফ-এর তরফ থেকে এ সিদ্ধান্তে এ যাবৎকালে (বিশেষত গত ১৪-১৫ বছর সময়কালে) বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বাস্তবমুখিতা ও আমাদের আগামীর সম্ভাবনার বিষয়ে বৈশ্বিক নীতি-নির্ধারকদের আস্থাটুকু প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের দেখানো পথে অন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরাও এগিয়ে আসবেন বলে ধারণা করা যায়। বিশ্ব ব্যাংক ইতোমধ্যে সরকারকে দেওয়া বাজেট সহযোগিতার পরিমাণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এডিবি আগে থেকেই বাংলাদেশে বেশি করে বিনিয়োগ করে যাচ্ছিল। এখন আরও করবে। জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকাও একই পথে হাঁটছে। এরই মধ্যে পাতাল রেলের জন্য ৪.২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মেগা প্রকল্পের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের এমন ইতিবাচক মনোভাব আমাদেরকে সংকটকালে বিশেষ ভরসা দিচ্ছে– তা ঠিক। তবে তাদের এমন এগিয়ে আসাটি প্রত্যাশিতই ছিল। কেননা, গত ১৪-১৫ বছর ধরে খুবই মুনশিয়ানার সঙ্গে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালিত হয়েছে। এতে করে এক দিকে ২০০৮-২০০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মুখেও আমাদের প্রবৃদ্ধি বলশালী থেকেছে। অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি ও তার ফলে বাড়তে থাকা মাথাপিছু আয়ের সুফল সামাজিক পিরামিডের পাটাতনের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রও নিশ্চিত করা হয়েছে। আর আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারীদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও এ সময়টিতে অন্য অধিকাংশ ইমার্জিং ইকোনমির চেয়ে আমরা সফলতা দেখিয়েছি। সর্বোপরি আমাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত নিজস্ব চাহিদার ওপর ভর করে (মনে রাখা চাই, জিডিপির ৭৩ শতাংশ ভোগ থেকে আসছে)। তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে টেকসই।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ৬১ শতাংশই হয়েছে এসময়ে (বর্তমানে বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি)। প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধির ৬০ শতাংশ এ সময়ে হয়েছে। আর রিজার্ভের আকার যতটা বেড়েছে তার তো ৮৭ শতাংশই এ সময়ে হয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই খাত আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির রক্ষাকবচ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কৃষি এখন অনেকটাই আধুনিক এবং বহুমাত্রিক মূল্য সংযোজন ধর্মী। এই অর্জনগুলোকে টেকসই করা সম্ভব হয়েছে ম্যাক্রো অর্থনীতির পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের দিকে সমান তালে নীতি-মনোযোগ দেওয়ায়। আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো এর অংশগ্রহণমূলক ধরন। নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার প্রসার এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সকল ক্ষেত্রেই সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি খাত ও অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর সমবেত উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণের 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট' তৈরির কৃতিত্ব সরকারের। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন: আইএমএফ, এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি) এ কারণেই বাংলাদেশের ওপর আস্থা রাখছে ধারাবাহিকভাবে। ইদানীং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সহযোগিতা দেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা তাই বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার তালিকার ওপরের দিকেই রেখে চলেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু না হলে বাংলাদেশের অগ্রগতি আরও কতটা গতিময় হতে পারত তা ভাবতে গেলেই অবাক হতে হয়।

তবে এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে নিজেদের কমতিগুলো পুষিয়ে নেওয়ার দিকেও নজর দেওয়া চাই। শুরুতেই আইএমএফ-এর যে ঋণ সহায়তার কথা বলেছি, সে সহায়তার জন্য কিছু সংস্কারের শর্ত রয়েছে। ঋণ পাওয়ার শর্ত বলে নয়, বরং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান ও টেকসই করার জন্য দরকারি সংস্কার কার্যক্রম হিসেবেই এগুলোকে দেখা উচিত। এসব সংস্কারের প্রস্তাব আমরাই আমাদের বাজেট ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উপস্থাপন করেছি। বিশেষ করে কর কাঠামো এবং করনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। দুঃখের কথা যে, আমাদের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত এখনও ৮ শতাংশের আশপাশে। আমাদের আশপাশের দেশের এই অনুপাত এর দ্বিগুণেরও বেশি। প্রধানমন্ত্রী যেমনটি বলেছেন, জোরজবরদস্তি করে নয়, সংস্কার করে উপযুক্ত জনসম্পদ ব্যবহার করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং

'ডিজিটাল আদায়' পদ্ধতি চালু করে এই অনুপাত বাড়ানো সম্ভব। আইএমএফও একই সুরে কর-জিডিপি অনুপাত বছরে ০.৫% করে বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। একইভাবে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতে চলমান ভরতুকি কাঠামোও আজীবন চলতে পারে না। আমাদের বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দাওয়াই এটিও। আইএমএফের প্রেসক্রিপশন নয়। আর্থিক খাতকে আরও বাজারনির্ভর এবং এই খাতের শাসন পদ্ধতি উন্নয়নের যে শর্ত আইএমএফ দিয়েছে তাও আমাদের ম্যাক্রো অর্থনীতির সক্ষমতা বাড়াবে। ব্যাংকের পুঁজি পুনর্ভরণের মতো 'বিলাসিতা' করার সুযোগ আমাদের নেই। তাই আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের টেকনিক্যাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ সংস্কারগুলো করা গেলে তা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

শক্তিশালী কৃষি খাত, রপ্তানি এবং প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে সচল রাখতে বড়ো ভূমিকা রেখে চলেছে। সে কারণেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনকে প্রশংসার চোখে দেখে সারা বিশ্ব। এর প্রকাশ ঘটে কদিন আগে বাংলাদেশ সফরে আসা বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাক্সেল ফন ট্রোটসেনবার্গের কথায়। বিশেষ করে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকায় যে অস্বস্তি বাংলাদেশের ছিল তা যেন অনেকটাই উবে গেছে। নিজের অর্থে ঐ সেতু নির্মাণ করে বিশ্বের কাছে যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান অগ্রযাত্রার নজির বাংলাদেশ রেখেছে তার প্রভাব মনে হয় বিশ্ব ব্যাংকের উপর মহলেও পড়েছে। তাই আমি অবাক হইনি যখন তিনি বলেন, 'সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, আর্থিক খাত, জ্বালানি এবং জলবায়ু সহনশীলতার খাতে জোরালো সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।' অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের সফলতার ট্র্যাক রেকর্ডই যে তার এমন আশাবাদের উৎস সেটিও তার আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে উঠে এসেছে। তিনি এদেশকে '৫০ বছরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন গল্পের একটি' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এক যুগেরও বেশি আগে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তার পরিণতিতে একদিকে যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এসেছে, অন্যদিকে আমাদের আর্থসামাজিক ভিত্তিটিও অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে। সেই নিজস্ব শক্তির কল্যাণেই বাংলাদেশ করোনাজনিত সংকট সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলার পাশাপাশি সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত অর্থনৈতিক চাপ সামলানোর ক্ষেত্রেও অন্য অধিকাংশ দেশের চেয়ে বেশি সুসংহত অবস্থায় রয়েছে। গেল ডিসেম্বরে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' উপলক্ষে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তী দুটি দশকের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার নতুন অভিযাত্রা শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁর সরকার 'স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি' –এই চারটি ভিত্তি মজবুতকরণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের জন্য ইতোমধ্যেই কাজ করতে শুরু করেছে। এই পরিকল্পনা ও প্রত্যয় আশাব্যঞ্জক তো বটেই, একইসঙ্গে আমাদের নিজস্ব সামাজিক পুঁজি ও সম্ভাবনাময় আর্থসামাজিক ভিত্তির সম্মেলনে যে আত্মশক্তি পুরো সমাজে সঞ্চারিত হয়েছে তার প্রতিফলনও এখানে ঘটেছে।

এ কথা সত্য যে, সার ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং আমদানিজনিত মুদ্রাস্ফীতি থেকে কম আয়ের পরিবারগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে। তবে কৃষিতে বিনিয়োগ করতে কখনই পিছপা হননি বাংলাদেশের কৃষক-অন্তপ্রাণ নেতৃত্ব। এবারেও তার ব্যত্যয় হবে না বলে আশা করা যায়। সুশাসনের বিশেষত আর্থিক খাতের যথাযথ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ তো রয়েছেই। এ অবস্থায় 'স্মার্ট বাংলাদেশে'র মতো উচ্চাভিলাষী অভিযাত্রার শুরুটা কতটা কার্যকর হতে পারে– সে প্রশ্ন আসতেই পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ২০০৮-এ যখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশে'র অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে, তখনও এ শতাব্দীর প্রথম বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি চাপের মুখেই ছিল। কৃষি উৎপাদন, রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহকে বেগবান করার কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় প্রসারিত ও সুসংহত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথরেখা ধরে দেশকে এগিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। এই নীতিকৌশলের মূল জায়গায় ছিল সর্বব্যাপী ডিজিটাইজেশন। এই ডিজিটাইজেশন কৌশলের সফলতার সবচেয়ে বড়ো নজির সে সময় স্থাপন করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে দেশের আর্থিক সেবা খাত। এর ফলে প্রকৃত অর্থনীতিতে অর্থায়ন সম্ভব হয়েছিল এবং একইসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাকেও দ্রুত বলশালী করা সম্ভব হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ২০০৮-২০০৯-এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি যেমন বেগবান করা গিয়েছিল, মানুষের জীবন মানের উন্নতিও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল।

আত্মশক্তির জোরে বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এই সংস্কৃতি বাঙালির মনে প্রোথিত করে গিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হতে যাচ্ছিল বলে মনে করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। যেমন কথা তেমন কাজ। বিদেশি সহায়তার মুখাপেক্ষী না থেকে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশে মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। আর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেওয়ার দিকে। তাই নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মাথাপিছু আয় ৯৩ ডলার থেকে ২৭৩ ডলারে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। কাজেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বড়ো স্বপ্ন বাস্তবায়নের যে পরম্পরা আমাদের আছে তার ওপর ভরসা করেই বলা যায়, চলমান সংকট মোকাবিলা করে আমরা 'স্মার্ট বাংলাদেশ'ও বাস্তবায়ন করতে পারব।

মোট কথা, একেকটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙেই বাংলাদেশ আজ এই পর্যায়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত এই লড়াকু জাতির সামনে এখন অপার সম্ভাবনার হাতছানি। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সামাজিক শান্তি, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা যে-কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। সবাই মিলে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের অন্তরের গহীনে থাকা অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য নিশ্চয় অর্জন করা সম্ভব হবে। সারা বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভঙ্গিটি অবলোকন করছে। এখন দরকার নিজেদের ওপর আস্থা রেখে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া। মার্চ মাস– আমাদের শক্তি ও সাহস অর্জনের মাস। মার্চ ফিরে এলে আমরা উদ্দীপ্ত হই, আরও উজ্জীবিত হই।

ড. আতিউর রহমান: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, dratiur@gmail.com

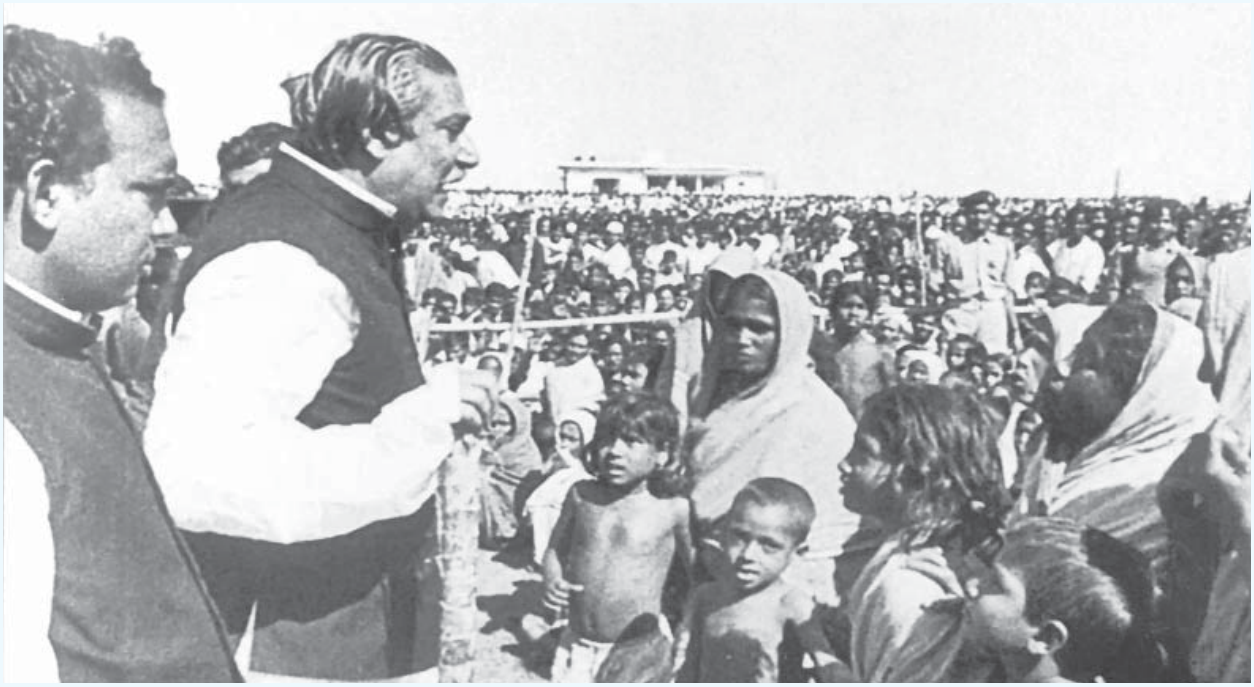

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত উপকূলে সর্বস্ব হারানো মানুষের দুঃখদুর্দশার বিবরণ শুনছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর ব্রত দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো

মোনায়েম সরকার

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ১৯২০ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর জন্ম। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম না নিলেও শেখ মুজিব কীভাবে একজন পরিপূর্ণ রাজনীতির মানুষ হয়ে ওঠেন তা আমাদের সবারই জানা দরকার। তাঁকে জানা-বোঝার জন্য তাঁর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* এবং *আমার দেখা নয়াচীন* বই তিনটি পড়া জরুরি।

বঙ্গবন্ধু যে একজন অসম সাহসী মানুষ ছিলেন তা এখন কারও অজানা নয়। এই সাহসের উৎস যদি আমরা খুঁজতে যাই– তাহলে দেখা যাবে মানবপ্রেম আর দেশপ্রেমই মূলত তাঁকে সাহসী হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। মানবতার অবমাননা হচ্ছে, মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে– এরকম ঘটনা চোখে পড়লে ছোটোবেলা থেকেই শেখ মুজিব প্রতিবাদ করতেন।

শেখ মুজিব তাঁর কৈশোরে স্কুলের ছাদ মেরামত করার জন্য বাংলার তৎকালীন দুই বরেণ্য রাজনীতিক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পথরোধ করে দাবি জানাতে দ্বিধা করেননি। ঐ ঘটনায় তাঁর সাহসের তারিফ করেছিলেন ঐ দুই বড়ো নেতা। স্কুল ছাত্র থাকতেই সোহরাওয়ার্দীর নজরে পড়েছিলেন শেখ মুজিব। পরে সোহরাওয়ার্দী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। আজকের দিনের শিশু-কিশোররা ভাবতেও পারবে না, কিশোর মুজিব কত সব মানবিক কাজ করেছিলেন। বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্র দান করে, অন্নহীনকে অন্নের ব্যবস্থা করে, সহপাঠীর সমস্যাকে আন্তরিকভাবে সমাধান করে তিনি সবার নজর কেড়েছিলেন। মানুষের প্রতি দরদ বা ভালোবাসা ছিল তাঁর মধ্যে সহজাত। কৈশোরে যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তা ধরে রেখেছিলেন আমৃত্যু। দেশের প্রশ্নে তিনি কখনোই কারও সঙ্গে আপোশ করেননি। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও কল্যাণচিন্তা তাঁকে সবসময় তাড়িত করত– দেশের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশপ্রেমের চূড়ান্ত নজির রেখে গেছেন। ভীরু বাঙালিকে সাহসী করে তুলেছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের কাছ থেকে সাহসের পাঠ আত্মস্থ করে বাঙালি মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছে।

শেখ মুজিবের চরিত্রে অনেক সদগুণের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তিনি কালজয়ী হতে পেরেছেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে খেয়াল করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। একটি মানুষ কী করে এতটা ক্ষমাশীল আর উদার হতে পারেন, তা যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেননি তাদেরকে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। পৃথিবীর কিছু কিছু নেতা লৌহমানব বা কঠিন শাসক হিসেবে পরিচিতি পেলেও বঙ্গবন্ধুর বৈশিষ্ট্য একেবারেই ভিন্ন। তিনি রাজনৈতিক নেতা হয়েও ক্ষমা, দয়া, ঔদার্যের যে মহান কীর্তি রেখে গেছেন, ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নেতা বঙ্গবন্ধু যতটা মহান ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুও ছিলেন একইভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও পরিপক্ব।

১৯৭৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণদান কালে বঙ্গবন্ধু বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলেছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে। বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণে বলেছিলেন, 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপোশ-মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তি কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহা ছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সাথে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি

নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।'

পাকিস্তানিরা তাঁর ওপর অন্যায় আচরণ করেছে, নির্বাচনে জেতার পরও ক্ষমতা দেয়নি, অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, তারপরও বঙ্গবন্ধুর প্রতিহিংসাপরায়ণ না হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা নয়।

বঙ্গবন্ধু কখনোই সংঘাত বা বিদ্বেষের রাজনীতিকে সমর্থন করেননি। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। নিজের ক্ষতি মেনে নিয়েও তিনি অন্যের সুখের জন্য চেষ্টা করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব বাঙালি সেনাসদস্য পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি সবকিছু করেছেন। ভারত বার বার বঙ্গবন্ধুকে যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে দরকষাকষি করতে বলেছিল, কিন্তু ভারতের সেই কথায় বঙ্গবন্ধু খুব একটা কান দেননি। তিনি উতলা হয়ে উঠেছিলেন পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি সন্তানদের জন্য। তিনি পাকিস্তানে আটক সেনাদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের চাকরিতে বহাল রাখলেন। যুদ্ধবন্দি সেনাসদস্যদের সাধারণত চাকরিতে বহাল রাখার তেমন কোনো নজির নেই– পাকিস্তানও সেটা করেনি। বঙ্গবন্ধু সেটা করলেন তাঁর ঔদার্যের কারণে। অথচ কী আশ্চর্য– যাদের তিনি সন্তান ভেবে চাকরিতে বহাল রাখলেন, জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, তারাই কি না ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে। তারাই তাঁকে রাতের অন্ধকারে সপরিবার হত্যা করল নির্মমভাবে।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে 'ট্রেইটর' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, 'This time Mujib will not go unpunished'. ইয়াহিয়ার এই কথায় এটা স্পষ্ট বোঝা যায়– বাংলার স্বাধীনতাকামী আপোশহীন বঙ্গবন্ধুই ছিলেন পাকিস্তানিদের বড়ো শত্রু এবং তাঁকে হত্যার ব্যাপারে পাকিস্তানিরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত যা করতে সাহস করেনি– তাই করল বাংলাদেশের পাকিস্তান ফেরত সেনাসদস্যরা। সাংবাদিক রবার্ট ফ্রস্ট একবার বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন– আপনার সবচেয়ে ভালো গুণ কী? বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি বাঙালিকে ভালোবাসি। এরপর প্রশ্ন ছিল– আপনার বড়ো দোষ বা দুর্বল দিক কী? বঙ্গবন্ধুর জবাব ছিল, আমি বাঙালিদের বড়ো বেশি ভালোবাসি।

বঙ্গবন্ধু যাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন, ঔদার্য দেখিয়েছিলেন, তারাই উন্মত্ত হয়ে বুলেট চালিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বুকে। পনেরোই আগস্টের ঘাতক এবং তাদের সহযোগী ও উপকারভোগীরা এখনও ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আওয়ামী লীগের নিশানা মুছে ফেলার জন্য। দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকারের উচিত হবে বাংলার ঘরে ঘরে মুজিব আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়া এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। বঙ্গবন্ধু একটি কথা বার বার বলতেন, 'বুকের রক্ত দিয়ে হলেও বাঙালির ভালোবাসার ঋণ আমি শোধ করে যাবো ইনশাল্লাহ।' বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা রেখেছেন, তিনি বুকের রক্ত দিয়েই বাঙালির ভালোবাসার ঋণ শোধ করে গেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আত্মত্যাগের ঋণ শোধ করা।

১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত– আমি শোষিতের পক্ষে।' আমৃত্যু বঙ্গবন্ধু শোষিত মানুষের পক্ষেই ছিলেন। এ কারণেই তিনি দেশের কৃষক-শ্রমিককে যুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় 'শোষিতের গণতন্ত্র'ই নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে বলে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি 'শোষিতের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই সোনার বাংলা হয়ে উঠত। ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুকে তাঁর স্বপ্ন পূরণের সুযোগ না দিয়ে সপরিবার তাঁকে হত্যা করে।

আজকের সভ্য মানুষ সমঅধিকারে বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি চাচ্ছে শান্তিপূর্ণ সুখী জীবন। একটি শান্তিপূর্ণ জীবন পেলে, সার্বিক নিরাপত্তা পেলে ব্যক্তিমানুষের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। জোর করে কোনোকিছু চাপিয়ে না দিয়ে মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা দরকার। নিয়ম মেনেই বিশ্ব এগিয়ে যাবে, তবে নতুন বিশ্ব কোন পথে চলবে, নতুন দিনের সমাজতাত্ত্বিকদের সেই কথাটা ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে যুক্তিকেই গুরুত্ব দিতে হবে। পৃথিবী অতীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে, দেখেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপতৎপরতা। সমাজতন্ত্র তথা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত প্রচেষ্টাও মানুষ দেখেছে। এখন তাই ভবিষ্যতের পৃথিবী নিয়ে মানুষ কোনো কল্পকথা শুনতে চায় না। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে পৃথিবীব্যাপী মানুষ আজ একটি মানবিক বিশ্বব্যবস্থা ও আইনের শাসন কামনা করছে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে আগামী দিনের সুখী, সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর পৃথিবী।

যে নেতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, সেই নেতার জন্মদিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক, আমরা মুজিব আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখি।

মোনায়েম সরকার: রাজনীতিক, লেখক ও মহাপরিচালক, বিএফডিআর

বঙ্গবন্ধু কর্নার

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ৬ষ্ঠ তলায় 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' নির্মাণ করা হয়েছে। কর্নারটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, ছবিসহ নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। এখানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংক যথা: সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংকের নামকরণ বাংলায় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ প্রামাণ্য দলিলের কপি রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নার-এ দর্শনার্থীরা বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত বই পড়ে তাঁর জীবন, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বোধ ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এখানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানা তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সুগভীর, যা বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সূচনাকাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেতনা প্রভাবিত এ চলচ্চিত্র ধারাকে তাই 'মুক্তিসংগ্রাম', 'মুক্তিযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা-পরবর্তী'— এই তিন কালপর্বে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রসমূহ। এমনকি এ কালপর্বে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নির্মাতারাও শামিল হয়েছেন এ প্রক্রিয়ায়। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম হয় দেশের এ নতুন চলচ্চিত্র ধারার।

মুক্তিযুদ্ধকালে নির্মিত চলচ্চিত্র

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধের সময় যার যা ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের সবাই। তাই সে সময়ের চলচ্চিত্রকারদের হাতের ক্যামেরা হয়ে উঠেছিল রাইফেল। আজ ক্যামেরার সেই কাজগুলো মুক্তিযুদ্ধের সজীব ও প্রামাণ্য দলিলচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনের দৃশ্য, ইয়াহিয়া, ভুট্টো, রাও ফরমান আলীর মতো ঘৃণ্য পাকিস্তানির দম্ভোক্তি, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে খালেদ মোশাররফের শপথবাক্য পাঠ করানোর দৃশ্য, জাতিসংঘের অধিবেশনে ভুট্টোর নিরাপত্তা সনদ ছিঁড়ে ফেলার দৃশ্য, জগন্নাথ হলের গণহত্যার দৃশ্য, প্রাণভয়ে নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে মানুষের দেশত্যাগের উদ্দেশ্যে অবিশ্রাম ছুটে চলা, মানুষের লাশের স্তূপ, শকুন-কুকুরের লড়াই, মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দৃশ্য, বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় প্রবেশ, স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে জনতার উল্লাস –এসবই ধারণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রসমূহে। আর ক্যামেরা হাতে যাঁরা অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান হলেন জহির রায়হান, বাংলাদেশের বিপ্লবী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১ সালে রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা নৃশংসতার দৃশ্য প্রথম ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল্লাহ। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বাসভবনের ছাদ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গণহত্যার দৃশ্য ধারণ করেছিলেন। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা হয় কলকাতায় ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, বাঙালির প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর শরণার্থী চিত্রকর্মীদের মাধ্যমে। ... এঁদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল জব্বার খান, জহির রায়হান, সৈয়দ হাসান ইমাম, আলমগীর কবির, উদয়ন চৌধুরী, সুভাষ দত্ত, নারায়ণ ঘোষ মিতা, সুমিতা, কবরী, সুচন্দা, বাবুল চৌধুরী, সাধন রায়, অরুণ রায়, আবু মুসা দেবু, আজমল হুদা মিঠু, রাজু আহমদ প্রমুখ।... সংগঠিত হয়ে সমিতি গঠন, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগ স্থাপন, ভারতীয় চিত্রকর্মী ও সংস্কৃতিসেবীদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও পাকিস্তানী

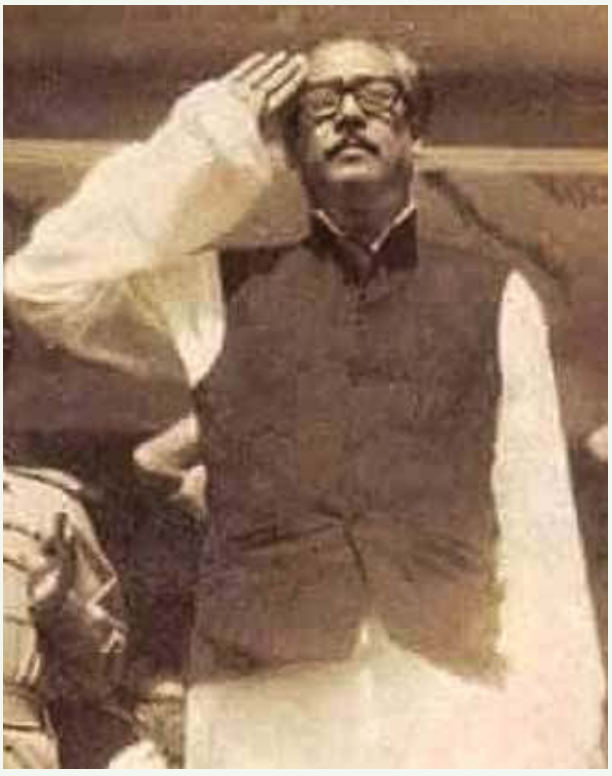

বাহিনীর বর্বরতা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ ও অন্যান্য কর্মসূচি...' (অনুপম, ২০১১: পৃ.৩১-৩২)।

রাজনীতি সচেতন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর দ্রুতই দেশত্যাগ করেন। ২১শে এপ্রিল ভারতে গিয়ে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। কলকাতায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান ও আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে প্রবাসেই সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইউনিট। গড়ে ওঠে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি', 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইনটেলিজেনশিয়া' এবং 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী সহায়ক সমিতি'। তাঁরা সেদিন যৌথ উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জীবন বাজি রেখে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে বাঙালিদের অদম্য সাহস, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার চিত্রগ্রহণ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশের মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) নির্মাণ করেছিলেন। আবার তিনিই নির্মাণ করলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১)। ২০ মিনিটের এই গণহত্যাবিরোধী যুদ্ধচিত্র সমগ্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার সচল ও জীবন্ত বার্তা প্রচার করেছিল পৃথিবীজুড়ে। যে কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। *স্টপ জেনোসাইড*-এ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার প্রমাণ্য দলিলচিত্র দেখে বিশ্ববিবেক আঁতকে উঠেছিল। এই প্রামাণ্য চলচ্চিত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে এবং বাঙালির ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন আদায়ে অসামান্য ভূমিকা রাখে। উপমহাদেশ ও ইউরোপ-আমেরিকা অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেনের (১৮৬৮-১৯১৭) পর জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)-ই হলেন

বিশ্বের একমাত্র চলচ্চিত্রকার, যিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

জহির রায়হান *Stop Genocide* চলচ্চিত্রের শুরুতেই লেনিনের স্কেচ ও বক্তব্য, ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবাজির দৃশ্য, ভিয়েতনামি শিশুর লাশ ও নাৎসি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য সংযোজন করেন, যা প্রমাণ করে এটা শুধু আমাদেরই না, এই ছবি পৃথিবীব্যাপী সব মুক্তিকামী মানুষের চেতনার প্রতীক। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে তিনি দেখেছিলেন দুনিয়াব্যাপী সবদেশের সকল নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের অংশ হিসেবে।

১৯৭১ সালের জুন-আগস্টের মধ্যে *স্টপ জেনোসাইড* নির্মাণ শেষ হলেও এক শ্রেণির লোকের বিরোধিতার কারণে এর ছাড়পত্র পেতে দেরি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের হস্তক্ষেপে সেপ্টেম্বর মাসে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী চলচ্চিত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি যৌথভাবে আলমগীর কবিরের সাথে *ধীরে বহে মেঘনা* নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণেরও পরিকল্পনা করেন।

বিদেশি নির্মাতাদের নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অগ্রসর চেতনার নির্মাতা ও গণমাধ্যম কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন বাঙালির চলচ্চিত্র-মুক্তিযুদ্ধে। ভারতীয় ফিল্মস ডিভিশন, বিবিসি, সিবিসি, এনবিসি, সিবিএস, এবিসি, গ্রেনাডা টেলিভিশন সে সময় অনেক তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রদর্শন করে। এছাড়াও বিদেশ থেকে আরও অনেক সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার, তথ্যচিত্র নির্মাতা এদেশের মানুষের দুঃখদুর্দশা আর হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ সংগ্রহে এসেছিলেন। তাদের ক্যামেরায় ধারণ করা চিত্র পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টেলিভিশন ও গণমাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে বিশ্বের দেশে দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বাংলাদেশের বিপ্লবী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানিদের নৃশংসতার শিকার অসহায় মানুষের পক্ষে আন্তর্জাতিক মহলে জনমত সৃষ্টি হয়েছে।

সারণি: বিদেশি নির্মাতাদের নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র

নির্মাতা/ অংশগ্রহণকারী	নির্মাণ-সংস্থা/ দেশ	প্রামাণ্যচিত্রের নাম
উমাপ্রসাদ মৈত্র, কলকাতা (প্রথম নির্মাণ)	ভারত	*জয় বাংলা*
আই. এস. জোহর, বোম্বে (হিন্দি ভাষায় নির্মাণ)	ভারত	*জয় বাংলাদেশ* (ছবিটি বর্তমানে নিষিদ্ধ)
সুকদেব এবং তপন ঘোষ	ভারত	*নাইন মান্থস টু ফ্রিডম, লুট অ্যান্ড ডাস্ট*
বিনয় রায়	ভারত	*রিফিউজি-৭১*
ঋত্বিক ঘটক	ভারত	*দুর্বার গতি পদ্মা*
গীতা মেহতা	ভারত	*ডেটলাইন বাংলাদেশ*
দূর্গাপ্রসাদ	ভারত	*দুরন্ত পদ্মা*
ভানিয়া কাউল	গ্রেনাডা টিভি	*মেজর খালেদ'স ওয়ার: সম্মুখ সমরে*
পিটার রজার্স	এনবিসি	*দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার*
নাগিসা ওশিমা	জাপান	*রাহমান: ফাদার অব বেঙ্গল*
নাগিসা ওশিমা	জাপান	*বাংলাদেশ স্টোরি*
নাগিসা ওশিমা	জাপান	*লিগেসি অব ব্লাড*
নাগিসা ওশিমা	জাপান	*জয় বাংলা*
বিবিসি	যুক্তরাজ্য	*হাও দ্য ইস্ট ওয়াজ ওয়ান*
গ্রানাডা টেলিভিশন		*দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এ্যাকশন*
মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্ট		*জেনোসাইড ফ্যাক্টর*
ম্যাকুম্বা ইন্টারন্যাশনাল	যুক্তরাষ্ট্র	*ওয়ার বেবিজ*
পপ-গায়ক জর্জ হ্যারিসন ও কিংবদন্তি সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর (অংশগ্রহণ)	যুক্তরাষ্ট্র	*দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ*
লিয়ার লেভিন	যুক্তরাষ্ট্র	*জয় বাংলা*
লিয়ার লেভিন (চিত্রগ্রহণ)	যুক্তরাষ্ট্র	*মুক্তির গান*

এসময়ই প্রখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিন *মুক্তির গান* চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রগ্রহণ করলেও তিনি ছবিটি শেষ করতে পারেননি। পরবর্তীকালে তারেক মাসুদ ও ক্যাথেরিন মাসুদ *মুক্তির গান* (১৯৯৫) চলচ্চিত্রের সেই ফুটেজ উদ্ধার করে আনেন আমেরিকা থেকে এবং পরে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন। বিদেশে বসবাসরত বাঙালি নির্মাতা সেন্টু রায় নির্মাণ করেছেন *টিয়ারস অব ফায়ার* এবং গাফ্ফার চৌধুরী নির্মাণ করেছেন *পলাশী থেকে ধানমন্ডি*।

মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কুশলীদের সাংগঠনিক তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছিল। ভারত সরকারের আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তায় চলচ্চিত্র বিভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়। জহির রায়হান, আলমগীর কবিরসহ অন্য চলচ্চিত্রকাররা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *স্টপ জেনোসাইড* ছাড়াও সে সময় জহির রায়হান নির্মাণ করেন *এ স্টেট ইজ বর্ন*। আলমগীর কবির নির্মাণ করেন *লিবারেশন ফাইটার্স*, বাবুল চৌধুরী নির্মাণ করেন *ইনোসেন্ট মিলিয়নস*।

কলকাতায় অবস্থানকালে জহির রায়হানসহ অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কলাকুশলীরা সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে পাকিস্তানি বর্বরতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। সম্মুখ রণাঙ্গনের ওয়ার-জার্নালিস্টদের মতো জহির রায়হান ও তাঁর ক্যামেরা ইউনিট সরাসরি রণাঙ্গন থেকে মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ গ্রহণ করতেন। তাঁর চলচ্চিত্রে উঠে আসে বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচার, গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, প্রতিবেশী দেশে শরণার্থী ঢলের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলো। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা ও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ, যুদ্ধের জন্য গেরিলাদের প্রশিক্ষণ, রণাঙ্গনের সম্মুখ যুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্রগুলোতে পরিব্যাপ্ত ছিল বঙ্গবন্ধুর সার্বিক উপস্থিতি, তাঁর মুখনিসৃত অমর বাণী 'জয় বাংলা'।

জহির রায়হান ১৯৭১ সালের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিজয় ক্যামেরায় ধরে রাখার জন্য শত্রুমুক্ত উত্তর বঙ্গের দিক থেকে ঢাকায় আসার জন্য তাঁরই দীর্ঘদিনের প্রোডাকশন ম্যানেজার চিত্তবর্ধনের নেতৃত্বে একটি ক্যামেরা দল পাঠিয়েছিলেন।

তিনি ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষভাগে বেসরকারি পর্যায়ে কলকাতায় গঠিত 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি'র সভাপতি এবং 'বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ'-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি ৯ই জুলাই কলকাতাস্থ মার্কিন দূতাবাসের সামনে বাঙালি নিধনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও মিছিলের আয়োজন করে। ১৯৭১ সালের ৩০শে নভেম্বরের পর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে জহির রায়হানের নেতৃত্বে দুটি চলচ্চিত্র ইউনিট গঠিত হয়। একটির নেতৃত্বে ছিলেন জহির রায়হান নিজে, অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন আলমগীর কবির। জহির রায়হান ঢাকা-ময়মনসিংহ নিয়ে গঠিত পূর্ব সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার চিহ্ন এবং মিত্র বাহিনীর অগ্রাভিযানের চিত্র ক্যামেরায় ধারণ করেন। আর আলমগীর কবির ধারণ করেন মিত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রা, যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন, খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও পথে পথে পাকিস্তানি নরপশুদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী চলচ্চিত্র ও বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ

বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র পছন্দ করতেন বলে জানা যায়। আর মুক্তমনা ও দূরদর্শী মানুষ ছিলেন বলেই চলচ্চিত্র উন্নয়নে এফডিসি প্রতিষ্ঠাসহ বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালকেরাও। ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র কর্মীদের উদ্দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, '... এই বাংলাদেশকে আমি বড়ই ভালোবাসি। তোদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, যদি পারিস– এই সোনার বাংলাদেশকে নিয়ে ছবি তৈরি করিস'। বঙ্গবন্ধুর এই আকুতির মাঝেই এদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও দিক নির্দেশনা ছিল। উল্লেখ্য, কলকাতায় অবস্থানের সময় জহির রায়হান 'স্বাধীন বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্প জাতীয়করণের খসড়া' প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুও চেয়েছিলেন বাংলাদেশের নিজস্ব ধারার চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটুক। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁরা কেউই তা আর বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি।

একাত্তরের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নারকীয় গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতনের তাণ্ডব শুরুর প্রথম প্রহরেই আটক করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একদিকে তারা রক্তের বন্যা ও ধ্বংসের অন্তরালে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল বাঙালির গর্ব, অহংকার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে, অন্যদিকে একই সাথে পাকিস্তানের কারাগারের অন্তরালে নিঃসঙ্গ কারাবাসের যন্ত্রণায় দগ্ধ করে চেয়েছিল বাঙালি জাতির প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও চেতনাকে গুঁড়িয়ে দিতে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল তারা।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস স্থায়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। এরপর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশের পুনঃগঠনের দায়িত্ব নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নানা আলোকে উদ্ভাসিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন চলচ্চিত্র নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি পায়। এসময় বাড়তে থাকে চলচ্চিত্র নির্মাণ। নির্মিত হতে থাকে নব্যধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার চলচ্চিত্র। এসময় আন্তর্জাতিক নানা উৎসবে পাঠানো হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। দেশে অনুষ্ঠিত হয় বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসব এবং চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

বঙ্গবন্ধু দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে দ্রুত কাজ শুরু করেন। তৈরি করেন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় চলচ্চিত্র খাতে বরাদ্দ হয়েছিল ৪ কোটি ১০ হাজার টাকা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত এই অর্থে ফিল্ম স্টুডিওর সম্প্রসারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন ফিল্ম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা, ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা এবং সারা দেশে ১০০টি নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্মসংস্থান হবে ছয় হাজার লোকের। পুনর্গঠিত হয় এফডিসি, সেন্সর বোর্ড, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, সংযোজিত হয় সেন্সর নীতিমালা। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে গতি পায়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ১৪-১৫টি চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করা হয় বঙ্গবন্ধুর সময়কালে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সিনেমাটোগ্রাফ রুলস ১৯৭২, দ্য সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট ১৯৬৩।

এসময়ের চলচ্চিত্রকে মোটা দাগে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, বাণিজ্যিক ধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর স্বতন্ত্র ধারা– এই ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে আলমগীর কবির তৈরি করেন আরও ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: *প্রগ্রাম ইন বাংলাদেশ*, *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে*, *বাংলাদেশ ডায়েরি* এবং *টুওয়ার্ডস গোল্ডেন বাংলা*।

বাণিজ্যিক ধারায় স্বাধীনতার পর নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *ওরা এগারো জন* (১৯৭২), *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২), *জয় বাংলা* (১৯৭২), *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), *বাঘা বাঙালি* (১৯৭২),

ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৩), *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), *আলোর মিছিল* (১৯৭৪), *সংগ্রাম* (১৯৭৪), *বাংলার ২৪ বছর* (১৯৭৪), *কার হাসি কে হাসে* (১৯৭৪), *মেঘের অনেক রং* (১৯৭৬), *বাঁধন হারা* (১৯৮১), *চিৎকার* (১৯৮২), *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪), *এখনও অনেক রাত* (১৯৯৭), *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৯৭) প্রভৃতি।

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের এই পর্বে প্রথাগত বাণিজ্যিক ধারার বাইরেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর এক স্বতন্ত্র ধারার উন্মেষ লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে। এসময়ের তরুণ নির্মাতারা পর্দায় আবারও বিপুলভাবে ফিরিয়ে আনেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট *আগামী* (১৯৮৪), *হুলিয়া* (১৯৮৫), *ধূসর যাত্রা* (১৯৯২), *একাত্তরের যীশু*, *একজন মুক্তিযোদ্ধা*, *একাত্তরের লাশ*, *মুক্তির গান* (১৯৯৫), *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪), *সেই রাতের কথা বলতে এসেছি* (২০০৩), *ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ* (২০০৯), *জয়যাত্রা (২০০৪)*, *শ্যামল ছায়া (২০০৪)*, *খেলাঘর (২০০৮)*, *রাবেয়া* (২০০৯), *নিঃসঙ্গ সারথি* (২০১০), *আমার বন্ধু রাশেদ* (২০১১), *মুক্তিযুদ্ধ '৭১* (২০১১) প্রভৃতি প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দেশভাগ, নারী মুক্তি, নতুন সমাজ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে– *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩), *লাঠিয়াল* (১৯৭৫), *সূর্যকন্যা* (১৯৭৬), *পালঙ্ক* (১৯৭৬), *সুপ্রভাত* (১৯৭৬), *সূর্যগ্রহণ* (১৯৭৬), *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৭), *বসুন্ধরা* (১৯৭৭), *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮), *সারেং বৌ* (১৯৭৮), *সূর্য দীঘল বাড়ি* (১৯৭৯), *রূপালি সৈকতে* (১৯৭৯), *সূর্যসংগ্রাম* (১৯৭৯) – এসব চলচ্চিত্রে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশীয় চলচ্চিত্রে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, চলচ্চিত্র হয়ে উঠছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় পুষ্ট।

উইকিপিডিয়ার সূত্রমতে, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫৪টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে ৩ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওপর সর্বাধিক ১৪ (চৌদ্দটি) ছবি তৈরি হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তিযুদ্ধের ছবি হয়েছে মাত্র ১ (একটি) তবে ১৯৭০-এর দশকের প্রায় প্রতিটি ছবিই আলোচিত ও অধিকাংশই ছিল প্রশংসিত। এদিক দিয়ে সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে নব্বই দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চরম হতাশার। এই দশ বছরে ছবি নির্মিত হয়েছে মাত্র ৭ (সাতটি)। এসময়ে সামরিক সরকার ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মনোভাবাপন্ন শাসনের কারণে মুক্তিযুদ্ধের ছবি নির্মাণ কমে যায়। এরপর তা ক্রমশ বাড়তে থাকে, বিশেষত ১৯৯০-এর দশকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুন গতিবেগ সঞ্চার হয়। এ দশকেই মুক্তি পায়– *নদীর নাম মধুমতি*, *আগামী*, *একাত্তরের যীশু*, *আগুনের পরশমণি*, *মুক্তির গান*, *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড*, *মুক্তির কথা'র মতো* চলচ্চিত্র। ২০০০-এর দশকে তৈরি হলো– *মাটির ময়না*, *জয়যাত্রা*, *শ্যামল ছায়া*, *মেঘের পরে মেঘ*, *ধ্রুবতারা*, *খেলাঘর* ও *রাবেয়া*। এরপর ধীরে ধীরে সরকারি অনুদানসহ নানা সুবিধা যুক্ত হলে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ।

সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রেকর্ড পরিমাণ ছবি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক ছবি ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। এখন নতুন পরিচালকরা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করছেন। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও এর প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অনুদান ও মুজিব জন্মশতবর্ষ নিয়ে চলচ্চিত্র আহ্বান– এ বিষয়ে নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করছে।

২০১০-এর দশকে মুক্তিযুদ্ধকে আধুনিক ঢঙে দেখা গেছে সেলুলয়েডে। মুক্তি পেয়েছে *মেহেরজান*, *খণ্ড গল্প ১৯৭১*, *অনিল বাগচীর একদিন*, *আমার বন্ধু রাশেদ*, *গেরিলা*, *পিতা*, *জীবনঢুলী*, *৭১-এর গেরিলা*, *৭১-এর সংগ্রাম*, *মেঘমল্লার*, *অনুক্রোশ*, *হৃদয়ে-৭১*, *৭১-এর মা ও জননী*।

বিদেশি চলচ্চিত্র বিষয়ে বঙ্গবন্ধু

আন্তর্জাতিকভাবে এদেশের নির্মাতা-কলাকুশলীদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বাইরের চলচ্চিত্রকে এদেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে ঢাকায় পোল্যান্ড চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৭৪ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে বিদেশে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধিত্ব করে। একইসঙ্গে পুরস্কারও পায়। ১৯৭২ সালের তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* পুরস্কার পায়। এটি পরে সিডালক পুরস্কারও অর্জন করে। ১৯৭৩ সালে সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* মস্কো, ১৯৭৪ সালে খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* ও মিতার *আলোর মিছিল* তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

দেশি চলচ্চিত্রের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়। একই বছর ভারত থেকে শুধু বাংলা চলচ্চিত্র আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় চলচ্চিত্র কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। একই সময়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমদানিকৃত উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র এদেশীয় আমদানিকারক ও পরিবেশকরা 'বাংলাদেশের সম্পত্তি' হিসেবে প্রদর্শনের অনুমতি চাইলে বঙ্গবন্ধু তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়। বিভিন্ন ছবি রপ্তানি বাবদ ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে ২ হাজার, ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে ১১ হাজার ও ১৯৭৪-১৯৭৫ অর্থবছরে ৫ হাজার ডলার আয় করতে সক্ষম হয়।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন: কবি, গবেষক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা, mjhm21bd@gmail.com

মুজিবনগর সরকারের তথ্যপত্র ও দলিল সমীক্ষা

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ অর্জন করে গৌরবোজ্জ্বল বিজয়। এ বিজয় ছিল সুদীর্ঘ এক সংগ্রামের সফল পরিণতি। বাঙালি জাতির সবচেয়ে উজ্জ্বল এ বিজয়ের সংগ্রামকে সফল পরিণতি দিতে একাত্তরে মুজিবনগর সরকার পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। শুরু হয় গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ। মহান এই মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, যা মুজিবনগর সরকার নামেই সমধিক পরিচিত। তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানের এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার।

নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, জনমত সৃষ্টি করা, সেক্টর কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে সচল রাখা– এই সমুদয় দায়িত্বই অত্যন্ত সফলভাবে পালন করে মুজিবনগর সরকার। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকার যেসব ঐতিহাসিক কাজ করে, তার একটি ছিল তথ্যপত্র প্রকাশ ও বিশ্বজনমত সৃষ্টি। প্রচারমাধ্যমে প্রেস রিলিজ প্রেরণ এবং বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ (External Publicity Division) থেকে জার্নাল প্রকাশ ছিল মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এক কাজ। এসব প্রেস রিলিজ এবং জার্নাল থেকে মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ডের নানা পরিচয় পাওয়া যায়।

কলকাতার ৯ নম্বর সার্কাস এভিনিউ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক পাঠানো প্রেস রিলিজসমূহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে মুজিবনগর সরকারের নানামুখী কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল প্রেরিত এক প্রেস রিলিজে সোভিয়েত সরকারের কাছে মওলানা ভাসানীর সহযোগিতার আবেদন সম্পর্কে জানানো হয়:

> In a telegram sent to the USSR President Podgorny, Prime Minister Kosygin and Secretary General Brezhnev, National Awami Party President Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani appealed to raise their voice against The Barbarities committed by Pakistan Army in Bangladesh and urged the Russain Government to give immediate recognition and all possible help to the Government of Bangladesh.

মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি এবং জনমত গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুজিবনগর সরকারের সদস্যরা মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতেন। ১৯৭১ সালের ১০ই মে প্রচারিত এমন একটি প্রেস রিলিজে দেখা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণ দেন। এ প্রসঙ্গে প্রেস রিলিজে বলা হয়:

> Syed Nazrul Islam, Acting President of People's Republic of Bangladesh in his address to the people of Bangladesh from the 'Swadhin Bangla Betar Kandra' today commended the role of Mukti Fouz. He expressed his strong hope that present phase of the struggle for liberation would very soon bring home the recognition of Bangladesh Government by many of the foreign countries. He further added, 'we have crossed the darkest period of our struggle and heading towards down.'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন থেকে প্রেরিত প্রেস রিলিজে দেখা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতের সরকার এবং সাধারণ জনগণের অপরিসীম সহযোগিতার চিত্র। কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে ভারতীয় জনসাধারণ যে অর্থ সাহায্য করেন, একাধিক প্রেস রিলিজে সে তথ্য এবং অর্থ প্রদানকারীদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়। জনৈক মি. বি. গাঙ্গুলী মাত্র এক টাকা সাহায্য করেন, তাও প্রেস রিলিজ থেকে যায়নি। ১৯৭১ সালের ১৩ই জুনের এক প্রেস রিলিজে জাতির উদ্দেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণের সংবাদ জানা যায়। ঐ ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধে আসন্ন বিজয় সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন,

My brave and suffering people: you have known both sorrows and ecstasies in your struggle. They have left you only stronger, your enemy weaker, a moral and economic destitute, and accused presence. To shorten our anguish we must attack make him simultaneously on all fronts. To this end, we must sure that no exportable

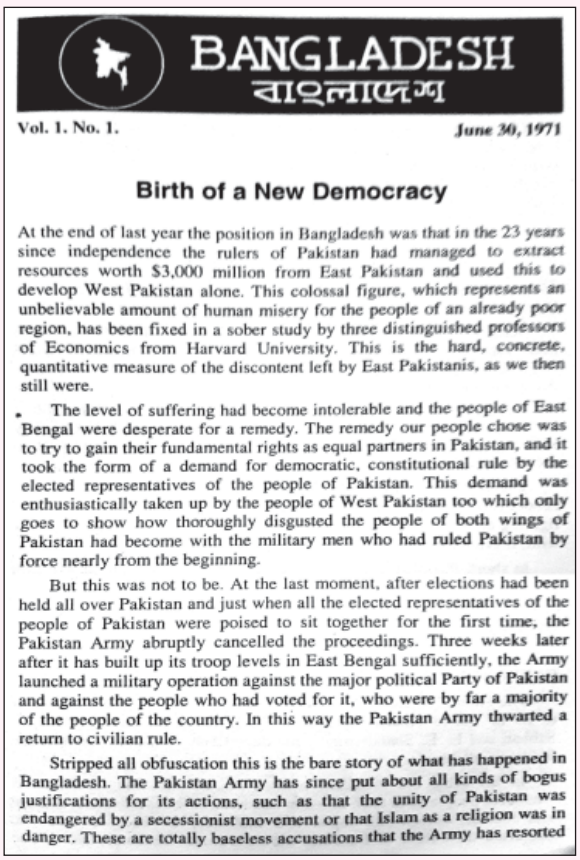

BANGLADESH
বাংলাদেশ

Vol. 1. No. 1. June 30, 1971

Birth of a New Democracy

At the end of last year the position in Bangladesh was that in the 23 years since independence the rulers of Pakistan had managed to extract resources worth $3,000 million from East Pakistan and used this to develop West Pakistan alone. This colossal figure, which represents an unbelievable amount of human misery for the people of an already poor region, has been fixed in a sober study by three distinguished professors of Economics from Harvard University. This is the hard, concrete, quantitative measure of the discontent left by East Pakistanis, as we then still were.

The level of suffering had become intolerable and the people of East Bengal were desperate for a remedy. The remedy our people chose was to try to gain their fundamental rights as equal partners in Pakistan, and it took the form of a demand for democratic, constitutional rule by the elected representatives of the people of Pakistan. This demand was enthusiastically taken up by the people of West Pakistan too which only goes to show how thoroughly disgusted the people of both wings of Pakistan had become with the military men who had ruled Pakistan by force nearly from the beginning.

But this was not to be. At the last moment, after elections had been held all over Pakistan and just when all the elected representatives of the people of Pakistan were poised to sit together for the first time, the Pakistan Army abruptly cancelled the proceedings. Three weeks later after it has built up its troop levels in East Bengal sufficiently, the Army launched a military operation against the major political Party of Pakistan and against the people who had voted for it, who were by far a majority of the people of the country. In this way the Pakistan Army thwarted a return to civilian rule.

Stripped all obfuscation this is the bare story of what has happened in Bangladesh. The Pakistan Army has since put about all kinds of bogus justifications for its actions, such as that the unity of Pakistan was endangered by a secessionist movement or that Islam as a religion was in danger. These are totally baseless accusations that the Army has resorted

> merchandise falls into the hands of the enemy, seek out collaborators and quislings and punish them, maintain solidarity with the freedom fighters who are fighting so that we can breathe freely in our land; be kind and helpful to fellow- suffers in the common struggle, be on your guard against enemy agents seeking to disturb Communal and sectional peace; and finally, have faith in the justness and invincibility of your cause. Our victory is assured.

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, অস্ত্রসহ নানাভাবে সাহায্য করেছে পাকিস্তান সরকারকে। মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই হীন আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, পত্রিকায় পাঠিয়েছে প্রেস রিলিজ। ১৯৭১ সালের ২৩শে জুন পাঠানো এক প্রেস রিলিজে দেখা যায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধির সংবাদ সম্মেলনের তথ্য: ...'Government of Bangladesh would appeal to the Government of USA (i) to call back the ships now carrying arms to Pakistan, (ii) Freeze stock of all U.S arms in Pakistan, and (iii) stop forthwith all further shipment of arms, equipment and supplies to Pakistan so as not to be a vital and continuing accessory to Pakistan so as not to be a vital and continuing accessory to genocide and uprooting of more millions of innocent defenseless People and want on destruction and devastation.' এভাবে দেখা যায় ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও নৈতিকতার শক্তিতে বলীয়ান বাংলাদেশ সরকার পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছে।

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে *BANGLADESH* নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করে। জার্নালের ইংরেজি শিরোনামের নীচেই 'বাংলাদেশ' কথাটি বাংলায় লেখা থাকত। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি। ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন *BANGLADESH* পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে *BANGLADESH* পত্রিকা পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'Birth of a New Democracy' শীর্ষক এক রচনায় বলা হয়: 'From Yahya's latest utterance we see that Pakistan Army has now made clear its intent to hold into power indefinitely. Democracy is dead in Pakistan and as a result, so is Pakistan itself. In its place we have put the people's Republic of Bangladesh which will be truly democratic both in spirit and in practice.'

BANGLADESH পত্রিকার চতুর্দশতম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। ওই সংখ্যায় প্রথমেই বিগত ছয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে এক পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। ওই পর্যালোচনায় বলা হয়:

> Within this period the liberation Army (Mukti Fauj) has been reorganized, and its naval and air units formed. Its two wings, the Regulars and the Volunteer corps today are well trained, well organised and determined to exterminate the enemy. They are hitting harder. Their patriotism, gallantry, accuracy have earned administration of all. Today, the enemy is demoralized, divided and helpless. They are sacred of the Mukti Bahini.

BANGLADESH শীর্ষক পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ পরিবেশিত হতো। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি সংখ্যাতেই এ বিষয়ে সংবাদ থাকত। ২৪শে নভেম্বর পত্রিকার সংখ্যায় দশ বছর বয়সি এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার অসীম বীরত্বের কথা প্রকাশিত হয়। মন্টু নামের ওই কিশোর সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয়:

> The other thing which struck me was the presence of a little boy among the guerillas. The boy, whose name is Montu, is hardly 10 years old, but already he has been in several battles, one of which was a major confrontation. He is always with the guerillas, carrying their spare ammunition and mortar shells or just being helpful. when we inquired why a little guy like that lad to go for operating, I was that nothing could stop him from going. When all efforts to dissuade him failed, he was allowed to stay on with the guerillas.

১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় *BANGLADESH* পত্রিকার সংখ্যা। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লগ্নে পৃথিবীর সব প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আহ্বান জানান। ৭ই ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণ শেষ করেন এভাবে:

> The final hour is round the corner, every Bengali should endeavour, in his own manner, to take part in this great achievement. Inshallah, we shall soon establish our full administrative control over the capital city of Dacca and only then the dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will come true.
>
> Long live Sheikh Mujibur Rahman.
>
> Long Live the straggling people of Bangladesh.
>
> Long Live Bangladesh Liberation Forces.
>
> JOI BANGLA (*BANGLADESH*, 15th December 1971)

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পরে ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় *BANGLADESH* পত্রিকার সর্বশেষ (২৬ তম) সংখ্যা। ওই সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যেখানে দেখা যায়, দেশ পুনর্গঠনের জন্য কোনো ধরনের মার্কিন সাহায্য গ্রহণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের না-সূচক অভিমত। পত্রিকার সংবাদটি ছিল এরকম:

> Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Bangladesh, completely ruled out the possibility of seeking any economic aid from the United States for rebuilding the new nations shattered economy.

মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ জানার জন্য সে সরকারের প্রেস রিলিজ ও পত্রিকা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করতে পারে। ওইসব তথ্য পর্যালোচনা করলে দূর হতে পারে অনেক বিভ্রান্তি।

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ: গবেষক, লেখক ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার সংবাদপত্রে ১৯৭১ উত্তাল মার্চের জনমতের চিত্র

ড. মো. এমরান জাহান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে ঢাকার সংবাদ ও সাময়িকপত্রে ব্যাপক জনমতের প্রতিফলন ঘটে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব ছিল ১৯৭১ সালের মার্চ মাস। ১লা মার্চ সামরিক প্রেসিডেন্ট আকস্মিক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা– বাঙালি জনতাকে সরাসরি স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চূড়ান্ত পর্যায়ে ধাবিত করে। এবার স্বাধীনতার লক্ষ্যে ধাবমান জনমত উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি তখন বাঙালি জনতার একমাত্র প্রতিনিধি। ৭ই মার্চ সেই বহু কাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটি আসে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তারপর সবই ইতিহাস। সেই ইতিহাস সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস। অতঃপর এক মহিমান্বিত স্বাধীন বাংলাদেশ। এই সংগ্রামে জনমতকে উদ্বুদ্ধ করতে ঢাকার সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

ঢাকার সংবাদপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার সংবাদপত্র ও সংবাদকর্মী রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সমান্তরাল ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে ঢাকার *দৈনিক ইত্তেফাক* জাতীয়তাবাদী পত্রিকার দায়িত্ব পালন করে। *দৈনিক ইত্তেফাক*এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর মারা গেলে পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন সিরাজুদ্দীন হোসেন। এদিকে বংশালের *দৈনিক সংবাদ*, মতিঝিলের বাণিজ্যিক পাড়া থেকে প্রকাশিত *দৈনিক পূর্বদেশ* ও ইংরেজি *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকেশ্বরীর কার্যালয় থেকে *দৈনিক আজাদ*, ইংরেজি *দৈনিক দি পিপল* ছিল ঢাকার প্রধান সারির দৈনিক। *দৈনিক পূর্বদেশ* ও ইংরেজি *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার* রাজনীতিক হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানায় প্রকাশিত হতো। তিনি আওয়ামী লীগের বিপরীত রাজনীতিক ছিলেন বরাবরই। কিন্তু পত্রিকা দুটি মোটামুটি স্বাধীন ছিল। *পূর্বদেশের* সম্পাদক ছিলেন মাহবুবুল হক এবং *পাকিস্তান অবজারভারের* সম্পাদক ছিলেন আবদুস সালাম। আর বার্তা সম্পাদক ছিলেন এবিএম মূসা। এই দুজনের ভূমিকাই ছিল অবজারভারের চালিকাশক্তি। এই সকল পত্রিকা জনমতের প্রতিফলন ঘটায়নি শুধু, জনমত সৃষ্টির ব্যাপারেও অগ্নিঝরায়। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল পাকিস্তান সরকারের ট্রাস্টের পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান*ও জনমতকে উপেক্ষা করতে পারেনি। *দৈনিক পাকিস্তানের* সম্পাদক ছিলেন কলকাতা যুগের সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল লগ্নে নতুন নতুন পত্রিকার আর্বিভাব ঘটে বিপ্লবী ভাবধারা গ্রহণ করে। *সাপ্তাহিক জনতা*, *সাপ্তাহিক গণশক্তি*, *সাপ্তাহিক একতা*, *সাপ্তাহিক স্বরাজ* এবং শক্তিশালী ইংরেজি *সাপ্তাহিক হলিডে* ছিল প্রধান ধারার সংবাদভিত্তিক সাপ্তাহিক। মার্চের শুরু থেকেই সংবাদপত্র বিশাল বিশাল শিরোনাম দিয়ে প্রতিবেদন এবং বিশেষ নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ শুরু করে।

অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা: সংবাদপত্রে প্রতিক্রিয়া

১লা মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ– এই ২৪ দিনে ঢাকার সংবাদপত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বিতীয় শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পত্রিকার সকল পাতাজুড়েই সারা দেশের মুক্তিকামী মানুষের এবং নানান সংগঠনের খবর ছাপা হয়েছে। দেশ মাতৃকার আন্দোলন এবং দাবিদাওয়া নিয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও বিশেষ সংবাদ, নিবন্ধ জনসাধারণের কাছে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সরকার সমর্থক পত্রিকা ও বাঙালি বিদ্বেষী ইংরেজি পত্রিকা *দৈনিক মর্নিং নিউজ* এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামির মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেনি। কিন্তু গণজোয়ার এত প্রবল ছিল যে

দৈনিক ইত্তেফাক

বিশেষ সংখ্যা

THE DAILY ITTEFAQ

শেখ মুজিবের নির্দেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পঁচিশের অধিবেশনে যোগদানের কথা বিবেচনা করিতে পারি, কিন্তু তার আগে——

বেতার কেন্দ্র বন্ধ

মার্চে এসে এসব বিরোধী পত্রিকা চলমান আন্দোলনের খবরাখবর ও বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছে নিয়মিত। *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় প্রকাশিত অসহযোগ আন্দোলনের খবর ও অন্যান্য সচিত্র প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকাটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর পরই এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে নিয়ম মাফিক প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে স্বাগত না জানিয়ে সরকারি পত্রিকাটি 'অপ্রত্যাশিত ও হতাশাজনক' বলে মন্তব্য করে। একই নিবন্ধে ভুট্টোর দাবিকে 'কৌতুকপ্রদ' বলে তিরস্কার করে।

ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা করে *দৈনিক ইত্তেফাক* ২রা মার্চ দীর্ঘ এক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'জনতার সংগ্রাম চলবেই'। আহমাদুল কবীরের সম্পাদনায় প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদ* ২রা মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের শিরোনাম দেওয়া হয় 'মিছিলের নগরী ঢাকা'। এই দীর্ঘ নিবন্ধে দেশবাসীকে চূড়ান্ত সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে লিখে, এসো জনতার ঐক্যে , এসো মুখরিত সখ্যে। এই সময় সংগ্রামী জনতার ধারাবাহিক আন্দোলনে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র জমায়েতে ছাত্র-জনতা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা ছিল বাঙালির পরবর্তী সংগ্রামের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত গোটা পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়।

ঢাকায় পাকিস্তান সরকারের সমর্থক কতিপয় পত্রিকা ছিল। সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ* ছিল এর অন্যতম। পত্রিকাটির মালিক ছিলেন খাজা নুরুদ্দিন এবং এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন মোহম্মদ বদরুদ্দিন। তিনি ছিলেন উর্দুভাষী বিহারি। পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে *মর্নিং নিউজের* নীতিতে অসহযোগ আন্দোলনে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি। কিন্তু এই সময়ে চলমান ঢাকার পরিস্থিতির খবর প্রকাশে পত্রিকাটি বেশি বিরূপভাব দেখাতে পারেনি।

সংবাদপত্রের ওপর সামরিক বিধিনিষেধ জারি

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তান সরকার ঢাকার গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল সৈয়দ মুহম্মদ আহসানকে সরিয়ে সে স্থলে লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ঢাকায় এসেই প্রথমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার পদক্ষেপ হাতে নেন। ১লা মার্চ এক সামরিক বিধি জারি করা হয়। তাতে বলা হয়, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হয়েছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে ২৫ নং সামরিক বিধি প্রয়োগ করা হবে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড।' কিন্তু ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ সামরিক আক্রমণের

পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংবাদ শিরোনাম, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও ছবি বিশ্লেষণ করলে কোনো অবস্থায়ই মনে হয় না যে, সে সময়ে সংবাদপত্র আদৌ উপর্যুক্ত বিধিনিষেধের কোনো তোয়াক্কা করেছে। বরং এ সময় একদিকে লাগাতার হরতাল অপরদিকে সরকারের জারি করা সান্ধ্য আইনের ফলে একমাত্র সংবাদপত্রই আন্দোলনকারী জনতার মূল প্রেরণা হয়ে ওঠে। ঢাকাসহ সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আওয়ামী লীগবিরোধী কোনো কোনো পত্রিকা ব্যবসায়িক কাটতির জন্যও অসহযোগ আন্দোলনের খবর, বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো উক্তি এবং ছবি প্রকাশের ব্যাপারে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। ২রা মার্চ থেকে ঢাকার দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের দৈনন্দিন কর্মসূচি নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হরতাল ও বিক্ষুব্ধ জনতার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ৪ঠা মার্চের হরতালের ঘটনাবলির বিবরণ দিতে গিয়ে ৫ই মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাকের* রাজনৈতিক ভাষ্যকার জয় বাংলার জয় শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ক্ষমতার দুর্গ নয়, জনগণই যে দেশের সত্যিকার শক্তির উৎস, বাংলাদেশের বিগত তিন দিনের ঘটনাবলি তাহাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিয়াছে'। ৪ঠা মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাক* 'ক্ষান্ত হউন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তানে নিরীহ জনতার ওপর সামরিক বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানায়। ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা দিয়ে সরকারি ট্রাস্টের *দৈনিক পাকিস্তান* ৫ই মার্চ একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গুরুত্বপূর্ণ সচিত্র প্রতিবেদনটিতে 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়,

> কলকারখানায় বাজছে না বাঁশী। মানুষ নেই অফিস আদালতে। অগ্নিগর্ভ দেশ আজ পথে নেমেছে। এক-দুই করে কাল কেটে গেছে চারদিন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় দেশ অগ্নিগর্ভ। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা যেন ভেঙ্গে পড়েছে। স্বাধিকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়াছে মানুষ–রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকায়; বিক্ষুব্ধ এই বাংলাদেশে।

সামরিক সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি থাকায় এ সময়ে মূলত সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের খবরাখবর সম্বন্ধে অবগত হয়। বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ জনগণের ওপর বর্বর হামলার বিবরণও পত্রিকার মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়।

৭ই মার্চের ভাষণ ও সংবাদপত্র

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দিবেন– তা আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। ২/৩ দিন পূর্ব থেকেই সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচার হচ্ছিল। ৭ই মার্চ *দৈনিক সংবাদ* 'বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে জনমতের ভাবনা বা প্রত্যাশা কী তা জানিয়ে দেয়। পত্রিকাটি রাজনৈতিক চাপ দিয়ে জনগণের চূড়ান্ত দাবি এই বলে লিখে– 'পরিষদের অধিবেশন বসুক আর নাই বসুক, এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না। জনগণের যে কোনো দাবী একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে; আপোশ বা আত্ম-বিক্রয়ের পথে নয়।'

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান। সকল সংবাদপত্র প্রচ্ছদ করে বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং পুরো ভাষণ। ঐ দিন যদিও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঢাকার টেলিভিশন এবং রেডিও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করতে পারেনি, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে সংবাদকর্মীরা প্রবল প্রতিবাদ করে কর্মবিরতি ঘোষণা করেছিল। পরের দিন ৮ই মার্চ ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকার ৮ কলামজুড়ে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এক্ষেত্রে ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজও* প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণদানরত ছবি ছাপিয়ে শিরোনাম দেয় 'Transfer power immediately', কিন্তু *পাকিস্তান অবজারভার* একই ছবি দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম করে, 'Sheikh Mujib speaks, No tax, boycott offices, schools, colleges, courts. TRANSFER POWER TO PEOPLES REPRENTATIVES'. এই দুটি ইংরেজি পত্রিকার পাঠক ছিল ঢাকায় অবস্থানরত সকল বিদেশি এবং ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত পাকিস্তানি উর্দুভাষিক সেনাসদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যেও *পাকিস্তান অবজারভারের* বেশ কাটতি ছিল। সেখানে বাঙালি পাঠকের কাছে ঢাকার একমাত্র *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার কপি চলে যেত। ফলে এই ইংরেজি পত্রিকার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানসহ বিদেশে দ্রুত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য পৌঁছে যায়। একইসঙ্গে ঢাকার বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন ছিল আরও আবেদনময়ী। বলা যায়, সংবাদপত্রের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে জনগণের নিকট মহিমান্বিত করে তোলা হয়।

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন দ্রুত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং তাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে থাকে। *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সমর্থক পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটি পল্টনের জনসভার বিশাল জনসমাবেশের ছবি প্রকাশ করে।

৯ই মার্চ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগের প্রধান আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। সে সূত্র ধরে ১০ই মার্চ সরকারি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* 'মুজিব-ভাসানী এক হবে' শিরোনামে ৪ কলামজুড়ে এক সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটি গুরুত্ব আরোপ করে। লক্ষ করার বিষয়, ৯ই ও ১০ই মার্চ প্রকাশিত দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই সংকট মুক্তির একমাত্র পথ' বলে পত্রিকাটি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে।

ঢাকার দৈনিকে যৌথ সম্পাদকীয় 'আর সময় নেই'

৭ই মার্চের ভাষণের পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এ ছিল পত্রিকার জগতের এক অভাবনীয় দৃশ্য। রাজনীতির এরূপ টালমাটাল অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন। রাজনৈতিক সংকট সমাধানকল্পে ১৬ই মার্চ থেকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক শুরু হয়। বহুল আলোচিত এ বৈঠক শুরুর প্রাক্কালে ১৫ই মার্চ ঢাকার প্রথম সারির চারটি দৈনিক পত্রিকা *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংবাদ* এবং *পাকিস্তান অবজারভার* 'আর সময় নাই' শীর্ষক এক যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *পাকিস্তান অবজারভারে* সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'TIME IS RUNING OUT'. যদিও *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদকীয় নীতিতে সব সময় রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার পক্ষে বলতে চেষ্টা করেছে। অভিন্ন বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত ১৫ই মার্চের উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জোর দাবি জানায়। অভিনব ও নাতিদীর্ঘ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে এক বাক্যে এক সুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বৎসরের ইতিহাসে জাতি আজ চরম সংকটে নিপতিত। দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্রদেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরীক হওয়ার পর দেশের আজ এই অবস্থা। ... আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনে এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের

নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া, যাহার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

১৬ই মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট হাউসে কড়া সামরিক প্রহরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক শুরু হয়। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ফলাফল নিয়ে সকল স্তরের জনতা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় সময় কাটায়। সংবাদপত্রেও এর প্রতিফলন ঘটে। *দৈনিক সংবাদ* ১৭ই মার্চ সম্পাদকীয় কলামে সেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে লিখে, 'এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল ইয়াহিয়ার এই সফর ও আলাপ-আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছে'।

Sovereign and Independent Bangladesh: The People

এ সময় কোনো কোনো পত্রিকা সকল প্রকার সংলাপ বন্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা– আন্দোলনের আহ্বানও জানায়। এরূপ প্রশ্নে সবচেয়ে সোচ্চার ছিল নব প্রকাশিত ইংরেজি *দৈনিক দি পিপল*। আবিদুর রহমানের সম্পাদিত *দি পিপল* ছিল চরম জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। Sovereign and Independent Bangladesh কথাটি সম্ভবত *দি পিপল*-ই প্রথম ব্যবহার করে। ১৭ই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রতিবেদন দিতে গিয়ে 'Mujib-Yahya meeting to decide whether Pakistan to stay or go:Independence of Bangladesh at Fait Accompli' শিরোনামে পত্রিকাটি জানায়–

> The frustrated people finally raised the demand of Sovereign and independent Bangladesh. They are no more prepared to be subjected to the undemocratic and repressive measures of a Government sitting, 1300 miles away.

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সরকার শেখ মুজিবের দেওয়া শর্তগুলো মেনে না নিলে পরিণামে বাঙালি স্বাধীনতা ঘোষণা করবে, এ মর্মে পত্রিকাটি আরও লিখে– 'Otherwise, Pakistan stands disintegrated, The Bengalees are resolute to achieve Independence, which under their dedicated leader, Sheikh Mujibur Rahman, has already been acccepted as almost a fait accompli.' *দি পিপল*-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন আবিদুর রহমান। ২৫শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম টার্গেট ছিল এই পত্রিকার কার্যালয়।

মুজিব-ইয়াহিয়া প্রতিদিনের বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের ব্রিফিং দিতেন। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তা দেশে-বিদেশে পাঠকের নিকট ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলো দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের খবর, রাজনৈতিক ভাষ্য ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনমতকে স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকে উজ্জীবিত করে।

দৈনিক পত্রিকাসমূহ যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ৪টি শর্তের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তা থেকে সমস্যা সমাধানের পথ বের করার নির্দেশনা দিয়েছিল, ঠিক তখন সমাজতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত কতিপয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ও *দি পিপল* সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানায়। এমনকি কোনো কোনো সাপ্তাহিকী মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনাকে 'আপোশরফা' এবং শেখ মুজিব জনগণের বৈপ্লবিক জাগরণকে কাজে লাগাতে চান না বলেও মন্তব্য করে। *সাপ্তাহিক গণশক্তি* ২২শে মার্চ এক নিবন্ধে এরূপ মন্তব্য করে যে, শেখ মুজিব জনগণের আন্দোলনকে আপোশরফার নামে বিভ্রান্ত করতে চায়। বদরুদ্দীন উমরের মালিকানায় ও সম্পাদনায় পরিচালিত হতো *সাপ্তাহিক গণশক্তি*।

একদিকে পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর' এরূপ বাঙালি জাতীয়তাবাদী জাগরণ, অপরদিকে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করতে পাকিস্তানি সামরিক শাসক পক্ষের অনাগ্রহ–এ দুয়ের কারণে বুঝা যাচ্ছিল, একটি সর্বাত্মক সশস্ত্র-সংগ্রাম অত্যাসন্ন। এরূপ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দ্বারা ব্যাপক গণহত্যার আগাম আশঙ্কা ব্যক্ত করে এনায়েত উল্লাহ খানের *সাপ্তাহিক হলিডে* লিখে–

> Anticipation of a Settlement not with standing the uneasy truce between Bengal and the military establishment of General Yahiya Khan may turn out to be a deceptive stratagem repressive violence. Faced as they are with a people's war, or at least the beginning of one when they can not isolate the fish from the sea and when counter insurgency techniques have failed to work, they might as well go for indiscriminate violence or genocide which literally means the total extermination of an intransigent people.

*সাপ্তাহিক হলিডে*র ন্যায় *সাপ্তাহিক স্বরাজ* জনতার আন্দোলনকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে এক দুঃসাহসী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই সাপ্তাহিকীটির সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমদ। এ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ন জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে অবস্থান করছিল। বাঙালি অফিসার এবং সৈনিকের সমন্বয়ে গঠিত এ ব্যাটালিয়নটিকে নিরস্ত্র করার জন্য ১৯শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এক পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল। জয়দেবপুরের চৌরাস্তার মোড়ে সংগ্রামী জনতা তাদের প্রতিরোধ করে এবং সৈনিক-জনতা সংঘর্ষে বেসামরিক লোক হতাহত হয়। উপর্যুক্ত *সাপ্তাহিক স্বরাজ* ২০শে মার্চের এক প্রতিবেদনে জনতার এ প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'মুক্তিসংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে' বলে মন্তব্য করে।

সাপ্তাহিক পত্রিকাটি একই প্রতিবেদনে এ মর্মে শঙ্কা ব্যক্ত করে যে, অচিরেই সামরিক বাহিনী প্রতিশোধের নেশায় 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও নির্মম সত্য যে, অল্পদিন পরেই *হলিডে* এবং *স্বরাজ* পত্রিকার উপর্যুক্ত মন্তব্য বাস্তবে পরিণত হয়।

২৫শে মার্চ কালরাত: গণহত্যা ও পত্রিকার কার্যালয় ভস্মীভূত

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রণীত গোপন নীলনকশা অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা মোতাবেক নিরস্ত্র বাঙালি জনতার ওপর বর্বর গণহত্যা শুরু হয় ২৫শে মার্চ রাত থেকে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়– সংবাদপত্র অফিস এবং সংবাদপত্রকর্মী ও সাংবাদিক। পাকিস্তান বাহিনীর গোলার আঘাতে একের পর এক আক্রান্ত হলো স্বাধীনতা স্বপক্ষের পত্রিকা অফিস ও কর্মরত সাংবাদিকগণ। ২৫শে মার্চ রাতেই কামানের গোলার আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয় *দি পিপল* এবং *গণবাণী* পত্রিকার অফিস। সামরিক বাহিনীর গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন *দি পিপল* অফিসে কর্মরত ছয় জন সাংবাদিক। পর দিন ২৬শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী *দৈনিক ইত্তেফাকে*র অফিসে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখপত্র *ইত্তেফাকে*র টিকাটুলির জমজমাট কার্যালয়টি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২৮শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর মুখপত্র বংশালের *দৈনিক সংবাদে*র অফিস পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকা অফিসে কর্মরত সাংবাদিক শহীদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার, *দৈনিক পূর্বদেশ* –এই দুটি পত্রিকার কার্যালয় ছিল মতিঝিলের একই বিল্ডিংয়ে। পত্রিকা দুটির মালিক ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। পাশের বিল্ডিংয়ে ট্রাস্টের পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তানে*র দপ্তর ছিল। এই তিনটি পত্রিকার অফিস তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু এ সকল পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকগণ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে এবং প্রগতিশীল সাংবাদিক। *দৈনিক পূর্বদেশে* ২৫শে মার্চ রাতে কর্মরত ছিলেন বার্তা সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মহাদেব সাহা এবং কামাল লোহানী। তাঁরা সবাই পরবর্তী সময়ে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের অধীনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মো. এমরান জাহান : প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, emran430@yahoo.com

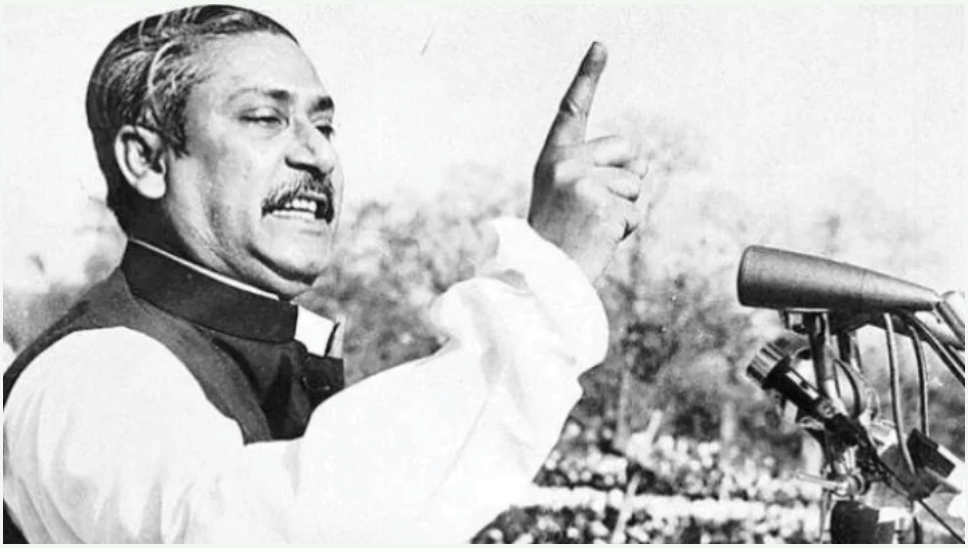

৭ই মার্চের ভাষণ ও বেতারে সম্প্রচারের অন্তরালে

প্রফেসর ড. মো. নাজমুল হক

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একটি অভিন্ন সত্তা, একটি অবিচ্ছিন্ন আবেগ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১-এর আগে এই বাংলা ভূখণ্ড কখনই স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। এদেশে সোয়া দুই হাজার বছরের ইতিহাসে উত্তর ভারতের মৌর্য শাসন, গুপ্ত-পাল-সেন রাজাদের সুদীর্ঘ রাজ্য পরিচালনা অথবা পাহাড়-অরণ্য-মরুভূমি-দরিয়ার ওপার থেকে ছুটে আসা মুসলিম সুলতান-বাদশা-নবাব, সাত-সমুদ্র-তেরো নদী অতিক্রম করে আসা ব্রিটিশ শাসক– সকলই বাঙালির পরাধীনতা ও দুঃস্বপ্নের অন্তহীন প্রহর। সবশেষে, নব্য উপনিবেশিক পাকিস্তানি শোষণ-অত্যাচার-বঞ্চনার অন্ধকার অধ্যায়। দুই সহস্রাধিক বছরের এই পরাধীনতার কুয়াশা ভেদ করে যিনি বাংলা ভূখণ্ডের দুঃখী মানুষের জীবনে প্রথম স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যের অভ্যুদয় ঘটালেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতির পিতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃখ করে যাদের বলেছিলেন, 'রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি', বঙ্গবন্ধু সেই 'বাঙাল'দের মানুষই করেননি শুধু, তাদের স্বাধীন, প্রতিবাদী, স্বপ্নময় ও বিশ্বজয়ী জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী পথচলায় ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয় দফা ঘোষণা এবং তার ভিত্তিতে স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের লড়াই, আগরতলা মিথ্যা মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণের জন্য ক্যান্টনমেন্টে আটক, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করেন। কিন্তু এরপরও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বঞ্চিত করে ক্ষমতা হস্তান্তরে শুরু করে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও টালবাহানা। ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ দুপুর বেলা বেতার ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন স্থগিত করে দেন অনির্দিষ্টকালের জন্য।

বিক্ষুব্ধ মার্চ, ১৯৭১ : মার্চের প্রথম তারিখে ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সেদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে চলমান একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মাঠ ভর্তি দর্শক উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে খেলা বর্জন করে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ ছেড়ে চলে আসে রাজপথে। খেলোয়াড়রা ছুটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ড্রেসিংরুমে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত শহর তথা সারা বাংলাদেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মিছিল ও প্রতিবাদে। বিকেল তিনটায় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বৈঠক ডেকে হরতালসহ কয়েকটি কর্মসূচি ও ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ঘোষণা দেন। সন্ধ্যায় সারা দেশে জারি করা হয় কারফিউ। এই দিনই দেশব্যাপী শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উত্তোলন করেন বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, যা সারা দেশের অফিস-আদালত-ঘরবাড়ি সর্বত্র উত্তোলিত হয়। ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের বিশাল জনসভায় বলেন, '২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আরো বুকের রক্ত দেব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহীদদের সাথে বেইমানি করব না। ... ভায়েরা আমার, আমি থাকি আর না থাকি, তবু আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে'। ১লা, ২রা, ও ৩রা মার্চের কারফিউ ভেঙে জনগণ নেমে আসে রাস্তায়। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে রাজপথে লাশ হয়ে পড়ে ৭৫ জন (মুনতাসীর মামুন, 'বাংলাদেশের পত্তন হয় ৭ই মার্চ', *কালের কণ্ঠ* , ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর বিশেষ সংখ্যা, ২০১৭)। এই প্রেক্ষাপটে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর অমোঘ ভাষণের মাধ্যমে বাঙালির মনের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর সারা দেশ পরিচালিত হয় মূলত তাঁরই নির্দেশে। চালু হয় সরকারের সমান্তরাল আরেকটি সরকার। এক সপ্তাহ পর ১৪ই মার্চ দ্বিতীয়বারের মতো বঙ্গবন্ধু আবারও অসহযোগ আন্দোলনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ১৫ই মার্চ নজিরবিহীন নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢাকায় আসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, ১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব অসফল বৈঠক, ২০শে মার্চ চতুর্থবারের মতো মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা। এদিন জেনারেলদের বৈঠকে বাঙালি হত্যার ষড়যন্ত্রপত্র 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুমোদন, ২১শে মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা আগমন ও গোপনে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক, ২২শে মার্চ ভুট্টোর উপস্থিতিতে ইয়াহিয়া-মুজিব ব্যর্থ আলোচনা, ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে প্রেসিডেন্ট ভবন ব্যতীত সারা দেশে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন, সব বড়ো অফিস বন্ধ, ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা এবং বিকালে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন, রাতে সেনাবাহিনীর বাঙালি গণহত্যা শুরু, গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার এবং ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ('৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ', *কালের কণ্ঠ* , ঢাকা, ৭ই মার্চ বিশেষ সংখ্যা, ২০২০)।

৭ই মার্চের ভাষণঃ এই দিন সকাল থেকে ঢাকা শহরের সমস্ত মানুষ যেন রেসকোর্স অভিমুখী হয়ে ওঠে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী শহর-গ্রাম থেকেও আসে হাজার হাজার মানুষ। প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষের প্রবল স্রোতে গম গম করতে থাকে রেসকোর্স ময়দান। বঙ্গবন্ধু ভাষণটি শুরু করলেন এভাবে: ' ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।... আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' বঙ্গবন্ধু ভাষণটি শেষ করেছেন তাঁর জনগণকে আশ্বস্ত করে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দেন– 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সে জন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।... ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' ৮ই মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু জনগণের জীবনধারণ ও অফিস-আদালত সংক্রান্ত ৩৫ দফা নির্দেশনা জারি করেন। ফলত, ২রা মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নির্দেশনাসমূহের সফল বাস্তবায়ন এটাই প্রমাণ করে যে, এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু (বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, '২৬শে মার্চের পূর্বাপর', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ২৬শে মার্চ ২০২১)।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে লালন করেছিলেন, দীর্ঘ সংগ্রাম ও জেল-জুলুম-অত্যাচারের প্রাচীর ডিঙিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলো। তিনি ভাষণে যা বলেছিলেন তা ছিল অনিবার্য। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এক একটা স্তর অতিক্রম করেছেন। এমনকি তাঁর ভাষণের প্রধানতম উক্তি– 'আর দাবায়া রাখতে পারবা না' এবং 'এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এটিও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। বঙ্গবন্ধু জনগণের এবং নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ড চাপের মুখেও সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি কিন্তু তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও ভাষার কলাকুশলতায় তিনি স্বাধীনতার প্রত্যাশা বিষয়ে মুক্তিপাগল জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সবটাই বলে দিয়েছিলেন। বস্তুত, ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়েই পত্তন ঘটে বাংলাদেশের, ২৬শে মার্চের ঘোষণাটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

কী ছিল সেই ভাষণে? : ওই সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিশাল প্রেক্ষাপটকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন মাত্র। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একে বলেছেন 'কথার অনুপম শিল্প' এবং এর কারিগরকে (বঙ্গবন্ধু) অভিহিত করেছেন 'রাজনীতির কবি' নামে। বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতেই উল্লেখ করেন বাঙালি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ ও ধারাবাহিক বঞ্চনার মর্মান্তিক ইতিহাস। বর্ণনা করেন শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মজাগরণ ও প্রতিবাদ সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। এরপর তুলে ধরেন বর্তমান জনগণের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার চিত্র এবং শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-হত্যা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের বিবরণ। সবশেষে তিনি আগামী সংকটময় দিনগুলোতে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশনা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেন বাংলাদেশের মুক্তিপাগল জনগণের চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন এঁকে দিয়ে।

৭ই মার্চের ভাষণটি কেবল বাংলার জনগণের বঞ্চনা ও মুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে পৃথিবীর শোষিত ও বঞ্চিত মানুষেরও শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার নিরন্তন প্রেরণা। ফলে বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে জাতিসংঘের 'ইউনেসকো' এই ভাষণকে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের কার্যক্রমের অধীন 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মূলত ৭ই মার্চের ভাষণটি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির ভিত্তি এবং ছাড়পত্র।

বেতারে ৭ই মার্চের ভাষণ সম্প্রচারের অন্তরালে : পূর্বে ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি বেতারে শোনার জন্য মুক্তিপাগল জনগণ ছিলেন উদগ্রীব। বিশেষত, ঢাকার বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা লাভের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। বঙ্গবন্ধুরও সে রকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব, সেটি তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর এই অভিপ্রায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ ও আমিনুল হক বাদশা তৎকালীন ঢাকা রেডিও স্টেশন প্রধান আশরাফ-উজ-জামানের কাছে উত্থাপন করেন। ভাষণ প্রচারের জন্য চাপ আসছিল বিভিন্ন দিক থেকেও। অসহযোগ আন্দোলন ও হরতালের কারণে এ সময় বেতার পরিচালিত হচ্ছিল সংকটের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'রিলে' করে খবর ও 'হুক আপ' অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছিল প্রতিদিন। এক দল পাকিস্তানি সৈন্য অবস্থান নিয়েছিল বেতার ভবনে। তারা ছিল সতর্ক পাহারায়। তবে এমন পরিস্থিতিতেও কর্মচারীদের সাহসী উদ্যোগে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিসহ আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও যোগাযোগ রেখেও প্রচারিত হচ্ছিল কিছু কিছু অনুষ্ঠান।

এ সময় সরকারের তথ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব জহুরুল হক এসে বেতারে যোগদান করায় নতুন করে উজ্জীবিত হন বেতারকর্মীরা। তিনি আন্দোলনের স্বপক্ষে ছিলেন। কর্মচারীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের এমন সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। বেতারকর্মীরা বাংলাদেশের সকল উপকেন্দ্র থেকে একযোগে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনি বললেন, 'আপনাদের কোনো বিপদের মধ্যে ফেলতে চাই না, যা করবেন বুঝে সুঝে করবেন' (আশরাফ-উজ-জামান, 'বাংলাদেশ বেতার ও শেখ মুজিব', *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, সম্পাদক, এস. কে. সুর চৌধুরী, বাঙালি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ: ৮০-৮৫)।

৭ই মার্চের ভাষণ সরাসরি বেতারে 'রিলে' করার প্রস্তুতিপর্বে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। ওই দিন ঢাকার শাহবাগস্থ মূল স্টুডিও থেকে অদূরবর্তী রেসকোর্স মাঠের বক্তৃতা মঞ্চ পর্যন্ত টেলিফোন লাইন স্থাপন, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, মাঠে রেকর্ডিং সরঞ্জাম নিয়ে আসা এবং ঢাকার বাইরের স্টেশনগুলোকে রিলের জন্য প্রস্তুত রাখা– সব কাজই সম্পন্ন হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। বেতারকর্মীরা উদ্বিগ্ন থাকলেও আশান্বিত ছিলেন। কিন্তু বাধা এল শেষ মুহূর্তে, প্রচণ্ডভাবেই এল। বঙ্গবন্ধু তখন মঞ্চে উঠেছেন। লক্ষ লক্ষ জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নির্ধারিত স্থানের দিকে। ঠিক তক্ষুণি স্টুডিওর সঙ্গে সংযুক্ত টেলিফোনে খবর এল– রিলে যাচ্ছে না। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। স্টুডিওতে স্থাপিত তাঁবু থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেরিয়ে

এসে তাদের ঘিরে ফেলেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন: 'Nothing of Sheikh Mujibur Rahman will go on the air until farther order'–Major Salek- (*কালের কণ্ঠ:* ৭ই মার্চ ২০২০)। বিষয়টি মঞ্চে উপস্থিত বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করলে তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে বক্তৃতার শুরুতেই উপস্থিত জনগণকে জানিয়ে দেন যে, 'রেডিও-টেলিভিশন' যদি আন্দোলনের খবর প্রচার না করে, তবে কোনো বাঙালি রেডিও-টেলিভিশনে যাবেন না।

বেতারকর্মীরা স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, আর ফিরে গেলেন না। বিকাল ৫টার সান্ধ্য অধিবেশনে নীরব হয়ে রইল বাংলাদেশ বেতার। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল উদ্বিগ্নতা, সর্বত্র থমথমে ভাব। এ পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে উঠলেন কুর্মিটোলার সামরিক সরকারের কর্মকর্তারা। তারা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করলেন বেতারকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের। রাত নয়টার দিকে রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র প্রধান আশরাফ-উজ-জামানকে খুঁজে পাওয়া গেল আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলামের বাড়িতে। যুগ্ম সচিব জহুরুল হক তাঁকে টেলিফোনে জানালেন, সামরিক শাসনকর্তা রাও ফরমান আলী হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজছেন, তিনি আশরাফকে তার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। আশরাফ-উজ-জামান টেলিফোনে ডায়াল করতেই পেয়ে গেলেন তাঁকে। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে উৎকণ্ঠিত রাও ফরমান আলী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'বেতার বন্ধ করলেন কেন? এক্ষুণি চালু করার ব্যবস্থা করুন'। আশরাফ জানালেন, 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না হলে বেতার পরিচালনা অসম্ভব। কর্মচারীরা কেউ কাজে যোগ দেবেন না'।...'কিন্তু ভাষণ প্রচার কী করে সম্ভব এখন? দিনের বেলাতেই ভাষণ প্রদান হয়ে গেছে'। ...'সেটা আমাদের ব্যাপার। বাধা না পেলেই হলো'।... 'এ্যালাউড। কিন্তু এখনই বেতার চালু করতে হবে'।...'অসম্ভব, সবাই চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সকালে যথারীতি চালু হবে। আর একটি কথা'... 'আরো শর্ত ?' 'না, অনুরোধ। বেতার ভবন থেকে সেনাদল ফিরিয়ে নিতে হবে।'... রাও ফরমান আলী আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আজ রাতেই তাদের উইথড্র করা হবে' (আশরাফ-উজ-জামান: প্রাগুক্ত)।

আশরাফ-উজ-জামান এবং তাঁর সঙ্গীরা বিজয়ীদের মতোই সেদিন রাতে নূরুল ইসলামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাজির হলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। সব শুনে চিন্তান্বিত হয়ে তিনিও প্রশ্ন করলেন, 'সেটা কী করে সম্ভব হবে, ভাষণের সব কথা তো মনে নেই।' আশরাফ-উজ-জামান জানালেন, 'আমরা সম্ভব করে তুলবো। ভাষণ বেতারে প্রচার না করা গেলেও স্টুডিওতে রেকর্ড করে নেওয়া হয়েছে। তাই প্রচার হবে বেতারে।' সব শুনে খুশি হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় রেসকোর্সে প্রদত্ত স্মরণকালের বিশ্বসেরা ভাষণটি পূর্ব পাকিস্তানের সব ক'টি বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হলো (আশরাফ-উজ-জামান: প্রাগুক্ত)। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ২৩শে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত তরুণ প্রজন্মকে এ ভাষণ শুনতে দেওয়া হয়নি, তারা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে প্রায় অন্ধকারেই ছিল।

৮ই মার্চ ১৯৭১ তারিখের সকল জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতারে প্রচার করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে বেতারকর্মীদের কর্মস্থল ত্যাগ ও সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরটি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। *দৈনিক সংবাদ*-এর প্রতিবেদনটি ছিল এরকম:

> গতকাল অপরাহ্নে বেতার কর্মচারীগণ কাজ ছাড়িয়া বাহির হওয়ার ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত কয়েক দিন যাবৎ বাংলার স্বাধিকার পাগল মানুষের প্রচণ্ড দাবির মুখে বেতার কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের গতকালের (৭ই মার্চ) রেসকোর্সের জনসভার ভাষণ বেতারে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত সিদ্ধান্তের কথা গতকাল দুপুরে স্থানীয় সংবাদ পাঠের সময় হইতে বেতার মারফত ঘোষণা শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে বেলা ২টা ৩০ মিনিট হইতে বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের উপস্থিতি পর্যন্ত (প্রথম অধিবেশন শেষ হওয়া সত্ত্বেও) বেতার অনুষ্ঠান চালু রাখা হয়। ঐ সময় সভার কাজ শুরুর বিলম্ব কাটানোর জন্য বেতার হইতে শুধু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হইতে থাকে। হাজার হাজার শ্রোতা তখন আপন আপন রেডিও সেটের পাশে শেখ সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বক্তৃতা শুরু হইতে যাইবে ঠিক সেই মুহূর্তে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বেতারে শেখ মুজিবের ভাষণ রিলে না করার নির্দেশ আসে। ফলে সেই মুহূর্তে তাড়াহুড়া করিয়া বেতারের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি ইহার প্রতিবাদে সকল বাঙালি কর্মচারীকে বেতার ও টিভি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আহ্বান জানান। কিছুক্ষণের মধ্যে সকল বেতার কর্মচারী শেখ সাহেবের আহ্বানে সাড়া দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া আসেন। ফলে গতকাল অপরাহ্ণ হইতে ঢাকা বেতার বন্ধ হইয়া যায়। ... গতকাল গভীর রাত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীবৃন্দ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় উপনীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ (সোমবার, ৮ই মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টায় শেখ মুজিবের রেসকোর্সের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণী ঢাকাসহ বাংলাদেশের সকল বেতার কেন্দ্র হইতে এক যোগে প্রচার করা হইবে (*কালের কণ্ঠ*, ৭ই মার্চ ২০২০)।

বস্তুত, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'টার্নিং পয়েন্ট'। এই ভাষণে প্রদত্ত 'ম্যাসেজটি' বাঙালি জাতির নিকট যেভাবে পৌঁছেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে ঘরে ঘরে দুর্গ, শুরু হয়েছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি'– সে সুযোগ তিনি পাননি। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ ৭ই মার্চের ভাষণকেই ধ্রুব নির্দেশ মেনে নিয়ে 'যার যা আছে তাই নিয়ে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। আসলে বাংলাদেশের পত্তন হয়েছিল ৭ই মার্চের সেই পড়ন্ত বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত দশ লক্ষাধিক মানুষের মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনির মাধ্যমে। তাই এ ভাষণটি বাংলার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য যেমন, তেমনি পৃথিবীর শোষিত ও স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট স্মরণকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ।

প্রফেসর ড. মো. নাজমুল হক: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, nazmul.brur.bn@gmail.com

দুর্নীতিকে না বলুন

দুর্নীতিকে না বলো
সৎপথে এগিয়ে চলো

অমিয় 'অগ্নি-উগারী বান'

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

'মানুষকে ব্যবহার, ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়। অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না'– (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২০০)। ১৯৪৭-এ উপমহাদেশ ভাগের পরই বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সেই সময় বেকার হোস্টেলে বসে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন, 'মাওড়াদের সাথে থাকা যাবে না।'

তিনি শেখ মুজিব! ১৯৬৬ সালে ছয় দফা পেশ করার পর শেখ মুজিব লন্ডন সফরে গেলে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, তখন বিবিসি'তে কর্মরত, বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন, 'ছয় দফা' বিষয়টি কী ? শেখ মুজিব তখনও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি। সৈয়দ হকের দিকে তিনটি আঙুল দেখিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, 'কত নিছো ? কবে দিবা ? কবে যাবা?'

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মোড় ঘুরানো এই 'ছয় দফা' আন্দোলনে বাঙালির ওপর নেমে আসা নির্যাতনে ভিন্ন এক মুজিবকে আবার কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। তিনি বিচলিত হয়ে লিখলেন *কারাগারের রোজনামচা*'য় ১৯৬৬-এর ৬ই জুন– 'এ ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনোদিন। নিজে ভোগ করতে নাও পারি, দেখে যেতে নাও পারি। তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদি ভোগ করবে।'

প্রাণাধিক প্রিয় বাঙালিদের জন্য আবেগমথিত হৃদয়ে আবার জেগে উঠল অগ্নি-উগারী বান। ৮ই জুন লিখলেন, 'যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করেছে, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না।'(*কারাগারের রোজনামচা*) এই হচ্ছে শেখ মুজিব। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখানে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি মনে পড়ে যায়। *The Story of my experiments with truth*- এ গান্ধীও এমন ভাবনার কথাই জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'যখন হতাশা কাজ করতো, আমি স্মরণ করতাম যে ইতিহাসে সবসময় সত্য ও ভালোবাসার জয় হয়েছে। অত্যাচারী ও খুনিরা সাময়িকভাবে অপরাজেয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের পতন অনিবার্য'।

বঙ্গবন্ধুর আয়ু ছিল মাত্র ৫৫ বছর ৪ মাস ২৯ দিন। কারাগারেই ছিলেন ৪ হাজার ৬৮২ দিন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। বন্দিজীবনের সময়টা তিনি অপচয় করেননি। লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মানস নির্মিতির ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, ভাবনা, আদর্শ, বাঙালির অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতির কথা। সেসব পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ৩৪৫ পৃষ্ঠার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) ও ৩০২ পৃষ্ঠার *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৮) এবং চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০ পৃষ্ঠার *আমার দেখা নয়াচীন* (২০২০)। তাঁর বিস্তৃত লেখার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে মানবিক মুজিব ও তাঁর ভেতরের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের সন্ধান করার ক্ষুদ্র চেষ্টা থেকেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। জাতির পিতার তিনটি বই থেকে দুটি বই (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা*) নিয়ে প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে টুকরো টুকরো কিছু আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে কত রঙের, কত রূপের, কত প্রকরণের এক মানুষকে যে পাওয়া যায়! বইটি যিনিই পড়েছেন তিনিই সম্যক জানতে পেরেছেন মুজিব মানসের নানান ধরনের অভিব্যক্তি, ভাবনা এবং নিজ মাটির প্রতি অন্তর্গত দৃঢ় অঙ্গীকার সম্পর্কে। সেই বয়ানে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা এবং মানবিক শেখ মুজিবকেও।

যুগে যুগে কিছু মানুষ আসেন যাঁদের নেতৃত্ব-দর্শন পালটে দেয় পৃথিবীকে, দেশকে, এমনকি দেশের মানুষকেও। তাঁদের আলোতে আলোকিত হয় মানুষ ও দেশ। শ্লাঘার সঙ্গে বাংলার জনগণ বলতে পারে, আমাদের একজন আছেন এমন, যাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' নির্মাণের প্রাক্কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কটল্যান্ডের নগর পরিকল্পনাবিদ ও নকশাবিদ স্যার প্যাট্রিক গিডেসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে একটি জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, আমি সেই মানুষ খুঁজছি যার মধ্যে থাকবে যথার্থ চিন্তা, যার অনুভব হবে মহান এবং যার আছে সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম করার কৌশলজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত এই তিন বৈশিষ্ট্যই যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি। তিনি হয়ত এখানে নেতৃত্ব সম্পর্কে সরাসরি কিছু লিখতে চাননি, কিন্তু তিনি না চাইলেও পরবর্তীকালে তাত্ত্বিকেরা নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই তিন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এই তিন গুণে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়কগণ ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন কালে কালে। তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, আত্মত্যাগ আর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদেরকে নিয়ে গেছে

চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে।

এই নেতারাই আবার কলম ধরেছেন তাঁদের মননের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *The Second World War* প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, It is not history, It is a contribution to the history. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করে ইতিহাস গড়েছেন, তেমনি তাঁর জীবনী লিখে ইতিহাসকে বাড়তি কিছু দিয়ে গেছেন, একথা অনস্বীকার্য।

আমাদের উপমহাদেশের অনেক রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কও আত্মজীবনী লিখেছেন। মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন *The Story of my experiments with truth;* জওহরলাল নেহেরু লিখেছেন *An Autobiography;* সম্রাট বাবরও লিখেছিলেন *বাবরনামা*। নেলসন মেন্ডেলা লিখেছেন *Long Walk to Freedom*। এরকম নজির যে ভূরি ভূরি, তা কিন্তু নয়। এই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যেও বিরল আমাদের জাতির পিতার তিনটি বই।

বঙ্গবন্ধুর বইগুলো মূলত সেই সময়ের শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দর্শন ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে ধারণা দেয়। তাঁর দর্শন ও কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছেন, 'যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে। আমি অনেকের মধ্যে দেখেছি, কোনো কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না। আমি চিন্তা ভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয় সংশোধন করে নেই।' আবারও গান্ধীর শরণাপন্ন হয়ে উল্লেখ করতে চাই, এখানেও তাঁর *আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ* গ্রন্থে এমনটিই যেন লিখেছেন, 'যদি আমার লেখার মধ্যে পাঠকের কাছে আমার অহংকারের সপ্তম সুরের আভাস পায়, তবে তারা অবশ্য জানবেন যে আমার সাধনার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।'

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তো এমনই। বঙ্গবন্ধু তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতির শীর্ষে উঠে আসেন। এটি কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। এজন্য তাঁকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি। বাংলাদেশে এমন কোনো মহকুমা নেই, এমন কোনো থানা নেই, যেখানে আমি যাইনি।'

বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত এই নেতার মূল দর্শন ছিল গণতন্ত্র, সাম্য, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত তাঁর রাজনীতির গুরু গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক ধারা; আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাজনীতি; নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনীতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ; নজরুল ও হুমায়ুন কবিরের সান্নিধ্যের প্রভাবে রাজনীতি ও সংস্কৃতির চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন রাজনীতির গতিপথ বিনির্মাণে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু সেই সময়ের ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তুলে ধরার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য, নির্যাতন এবং অধিকার ও সম্পদ লুট করার জ্বলজ্বলে চিত্র তুলে ধরেছেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজির দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সমৃদ্ধ হয়েছে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। সঙ্গে রয়েছে তাঁর বংশপরিচয়, শৈশবকাল এবং শিক্ষাজীবনের নির্মোহ বর্ণনা।

'মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়'– এ উপলব্ধিই বুঝিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের মূল দর্শন কোথায় বাঁধা। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সচেতনতা এবং এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ ও সুগভীর। বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভাষণেও এর প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও অগণিত মানুষের মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন, 'যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮) বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর ভেতরে কীভাবে এক আগ্নেয়গিরির জন্ম নিচ্ছে ধীরে ধীরে, তা এসব লেখনীর মধ্য দিয়ে মূর্ছিয়ে ওঠে।

অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও নেতৃত্বের কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষ বসুর ভক্ত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ত্যাগী ও কারানির্যাতন ভোগকারী সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ টেনে লিখেন: 'জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮)

আওয়ামী মুসলিম লীগের নামকরণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেন, 'আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু মেনিফেস্টো থাকবে'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২১)। সকল ধর্মের সহাবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি যেমন তাঁর জীবনী ও রোজনামচা লিখতে গিয়ে বার বার দুস্থ ও গরিবের প্রসঙ্গ এনেছেন, তেমনি বিভিন্ন ভাষণেও দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারি টাঙ্গাইলে, তিনি তখন আমাদের জাতির পিতা, এক জনসভায় বলেছিলেন, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শোষকদের আর বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। গরিব হবে এই রাষ্ট্র এবং এই সম্পদের মালিক, শোষকরা হবে না। এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র– 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা

হবে। কিন্তু এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়। বঙ্গবন্ধুর মানস নির্মিতি ও রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া যায় তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচায়*।

ছাত্রাবস্থায় মাদারীপুরে স্বদেশ আন্দোলনকারী ও তাঁদের নেতা অধ্যক্ষ পূর্ণেন্দু দাসের মুক্তিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতা ও তাতে 'জয় বাংলা'র উল্লেখ এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পার্টির সাথে যোগাযোগের কারণে তাঁর মনোজগতে প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র রোপিত হতে থাকে। পাশাপাশি নিয়মিত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা, কবি নজরুল ও কবি হুমায়ুন কবিরের সাথে সখ্যতা তাঁর শুদ্ধ সংস্কৃতি মনস্কতা সৃষ্টিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। তিনি হতে থাকেন পুরোপুরি এক বিশুদ্ধ বাঙালি।

বাংলার নদী, বাংলার জল, বাংলার খাবার, বাংলার গান, বাংলার উর্বর জমি আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাঁকে সবসময় বিমোহিত করত। একবার এক অনুষ্ঠান শেষে নদীপথে নৌকা দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে আসছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন ছিলেন সহযাত্রী। পথে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তিনি লিখেন, 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *কারাগারের রোজনামচায়* ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে, এ আত্মবিশ্বাস বার বার তাঁর (বঙ্গবন্ধু) লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষদ্বাণী করতে পেরেছেন কি না জানি না।'

কারাগারের রোজনামচায় ৭ই জুন ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধু লিখলেন, 'জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে, খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কি করতে পারি।'

তাঁর হাত দিয়ে বাঙালি যেমন নিজের রাষ্ট্র পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আদর্শ। এই তিনিই তো ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই'। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসীম আত্মবিশ্বাস, গভীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের মানসিকতার পাশাপাশি মানুষের ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুকে স্বীয় স্থানে পৌঁছে দেয়। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু আজ 'জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত'।

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *The Wings of Five*-এ লিখেছেন, 'আমরা সবাই আমাদের ভেতরে এক স্বর্গীয় আগুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের উচিত এই আগুনে ডানা জুড়ে দিয়ে সেই আলোর মহিমায় পৃথিবীকে মহিমান্বিত করে দেওয়া।' ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক ছোটো আগুনের ফুলকি নিয়ে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান খোকা। তাঁর অন্তর্গত ফুলকিকে প্রজ্বলিত মশালে রূপ দিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বকে আলোকিত করেছিলেন। এই ধ্রুব সত্য তাঁর শত্রুরাও অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য। কবি জসীমউদদীন তো তাঁকে নিয়েই লিখেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান/ যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান'।

পরীক্ষিৎ চৌধুরী : কবি, প্রাবন্ধিক ও সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে টানা সপ্তম বারের মতো যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ অংশীদারিত্বে দিবসের আয়োজন করে ডেনমার্ক, গুয়াতেমালা, হাঙ্গেরি, ভারত, মরক্কো ও পূর্ব তিমুর। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি সাবা কোরেশি (Csaba Kőrösi)।

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষায় গোটা অনুষ্ঠানটি অনুবাদের ব্যবস্থা রাখা হয়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রী চিন্ময় কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিম সংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদগণ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই জাতির পিতার নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম, যার চূড়ান্ত পরিণতি পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের মাধ্যমে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, অন্যান্য কূটনীতিক, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল অনুষ্ঠানটি। জাতিসংঘ ওয়েবটিভিতে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আগে সকালে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মিশনে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দের এবং মহান একুশের ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়

নাসরীন মুস্তাফা

বাঙালির একটি স্বাধীন দেশ হবে– এই স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী পাকিস্তান মুল্লুকে একজনেরই ছিল। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাঙালির স্বার্থরক্ষার জন্য সব সময় সোচ্চার থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসে অমোচনীয় ছাপ রেখে প্রতিটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দিতে বাঙালিকে স্বাধীনতাকামী জাতিতে পরিণত করেছেন, অত্যন্ত সুগভীর পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশকে সম্ভব করে তুলেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণায় কী বলা হবে এবং ঘোষণাটি সব বাঙালির কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তার মূল সিদ্ধান্ত তিনিই নেন। ছয় দফার রূপরেখা প্রণয়নের সময়ও তিনি মূল সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছিলেন। একথা সবাই জানি যে, স্বাধীনতার ঘোষণায় কী বলা হবে, তার ইঙ্গিত ছিল ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণে। বঙ্গবন্ধুর জীবনে দেওয়া সংক্ষিপ্ততম অলিখিত এই ভাষণে তিনি বজ্রকণ্ঠে তর্জনী উঁচিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। স্বাধীনতার আগে বললেন মুক্তির কথা– চারবার বললেন মুক্তি শব্দটি, স্বাধীনতা একবার। আদেশ দিলেন ‘যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা’ করার, যার অর্থ চূড়ান্ত স্বাধীনতা আনতে জনগণের গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তির সংগ্রাম করতে হবে।

এরও আগে ৩রা মার্চের জনসভায়ও তিনি বলেছিলেন, ‘হয়ত এটাই আমার শেষ ভাষণ। আমি যদি নাও থাকি আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন যাতে না থামে।’

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে স্বজাতিকে জানিয়ে দিলেন প্রস্তুতি নাও। কূটচালে মত্ত ইয়াহিয়া-ভুট্টো গেরিলা মুজিব যে কৌশলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়ে বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করে ফেলেছেন, বিন্দুমাত্র টের পায়নি। ২৫শে মার্চের কালরাতে হায়েনার দল ঘুমন্ত বাঙালির ওপর যখন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গণহত্যার উন্মত্ততায়, তখন গেরিলা মুজিব বুঝে গেলেন, সময় এখনি। গণহত্যা শুরু হতেই খুব অল্প সময়ে তিনি প্রস্তুতকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা যাতে সব বাঙালির কাছে পৌঁছে যায়, পরিকল্পনামাফিক সেই কাজ করে যান। তিনি তো জানতেনই, এতেই শুরু হয়ে যাবে সর্বাত্মক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে বাঙালি, তিনি জানতেন। যুদ্ধে জয়ী হলে দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীনতার সেই সূর্য তিনি হয়ত স্বচক্ষে দেখতে পারবেন না, কিন্তু বড়ো তৃপ্তিই তো– তাঁর বাঙালি স্বাধীনতার জন্য লড়বে।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি ছিল ইংরেজিতে লেখা। বাংলা করে বার্তাটি বিভিন্নভাবে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তখন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা প্রচারের জন্য ট্রান্সমিটার দরকার ছিল। আর ছিল ওয়্যারলেস শিপিং চ্যানেল, যার মাধ্যমে সমুদ্রে জাহাজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল। স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালির হাতে পৌঁছে দিতে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ট্রান্সমিটার আর ওয়্যারলেস প্রযুক্তি। তৈরি করেছিলেন তিনটি প্ল্যান।

বঙ্গবন্ধুর টেপকৃত স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা টেলিফোনের মাধ্যমে প্রচার

বঙ্গবন্ধুর জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি বঙ্গবন্ধু স্বকণ্ঠে পড়ে রেকর্ড করেছিলেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর প্রকৌশলী নূরুল হক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খুলনা থেকে একটি ট্রান্সমিটার জোগাড় করেছিলেন। এই নির্দেশের কথা আর কারোর জানা ছিল না, নূরুল হক পরিবারের সদস্যদেরকেও জানাননি। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে ট্রান্সমিটারটি বসিয়ে দেন তিনি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানার সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, গণহত্যা শুরু হলে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আগে বঙ্গবন্ধুর টেপকৃত বার্তা এই ট্রান্সমিটার দিয়ে টেলিফোনে বিভিন্ন নেতা ও সূত্রের কাছে পাঠানোর কাজটি করেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ কর্মী হাজী মোহাম্মদ মোর্শেদ। বঙ্গবন্ধুর সাথে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকেও।

বঙ্গবন্ধুর টেপকৃত স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া

বঙ্গবন্ধুর জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়া আরও জানান, টেপকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাসংবলিত বার্তাটি প্রকৌশলী নূরুল হক প্রচার করেন এবং ট্রান্সমিটারসহ ধরা পড়লে তাঁকে আর পাওয়া যায় না।

আরেকটি টেপকৃত বার্তা দেওয়া হয়েছিল ইপিআরের (পরবর্তীতে বিডিআর, বর্তমানে বিজিবি) সুবেদার মেজর শওকত আলীকে। পাকিস্তানি সরকার ইপিআরপ্রধান ছাড়া আর সবার ‘মাস্ট’ই বন্ধ করে দিয়েছিল। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ইপিআরপ্রধানের মাস্ট ব্যবহার করে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের

পর বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোন করেন তিনি। ফোনকলটা রিসিভ করেন হাজী মোহাম্মদ মোর্শেদই। ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটি কণ্ঠ (শওকত আলীর), আমি বলধা গার্ডেন থেকে বলছি। মেসেজ পাঠানো হয়ে গিয়েছে। (তথ্যসূত্র: *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া)

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কমান্ডার টিক্কা খানের গণসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তার *উইটনেস টু সারেন্ডার* বইয়ে ট্রান্সমিটারে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে রেকর্ড করা স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছেন বলে লিখেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠানোর গেরিলা কৌশল দ্রুতই ধরে ফেলে হানাদাররা। শওকত আলীকেও আর ফিরে আসতে দেওয়া হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেস শিপিং চ্যানেলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া

১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস *প্রতীতি* নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। কাস্টমস-এর জয়েন্ট কালেক্টর আবদুল কাইউমের 'সেই কালো রাত' শিরোনামে একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা ছিল সেখানে। জানা গেল, নিজের অজান্তেই বঙ্গবন্ধুর প্ল্যানের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই রাতে মগবাজার ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) ওয়্যারলেস স্টেশনের যে সহকারী প্রকৌশলী, তিনিই হচ্ছেন এই মো. আবদুল কাইউম। প্রকৌশলী আবদুল কাইউম পরবর্তীকালে কাস্টমস ক্যাডারে যোগদান করেন। তাঁর স্মৃতিচারণ, গবেষণা ও ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের বয়ান থেকে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছিল, তা সুস্পষ্ট।

২৫শে মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধু অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির হাত দিয়ে স্বহস্তে লেখা একটি চিরকুট পাঠান মগবাজার এক্সচেঞ্জে। প্রকৌশলী আবদুল কাইউম চিরকুটের বাংলা লেখা পড়েই বুঝতে পারেন, এই হচ্ছে বাঙালির মুক্তির সনদ, এই হচ্ছে সেই মহার্ঘ্য স্বাধীনতার ঘোষণা। এক্সচেঞ্জে বার্তা পাঠাতে হতো ইংরেজিতে। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুর পাঠানো ঘোষণাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁর সহকর্মী অপারেটর মেজবাহ উদ্দিনের সাহায্য নিয়ে ২৬শে মার্চ ভোরে ভিএইচএফ লিংক ব্যবহার করে সারা দেশে এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত জাহাজের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বিশ্বময় পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণা হাতে পেয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা সলিমপুর ওয়্যারলেস অফিসের কল্যাণে চট্টগ্রামে এবং অন্য চারটি লিংকে পাঠানো বার্তা শহরে ও গ্রামে পৌঁছে দেন। (তথ্যসূত্র: *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে*, সিরাজুল ইসলাম মুনির)

প্রতীতি'তে প্রকাশিত আবদুল কাইউমের 'সেই কালো রাত' শিরোনামের লেখাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি (ঐতিহাসিক বিষয়ের বিবেচনায় প্রকাশিত লেখার বানান হুবহু রাখা হয়েছে):

> একাত্তুরের পঁচিশে মার্চের কালো রাত নিয়ে বহু লেখা বেরিয়েছে বিগত বারটি বছর ধরে। লেখনী শক্তির অভাবে শুধু আমার দেখা পঁচিশে কালো রাত প্রকাশ পায়নি। আমার দেখা সামান্যই। তবু কিছু তো দেখেছি। ... তবু লিখছি যদি কেউ পড়ে।
>
> একাত্তুরের গণ-অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে সাড়া দিয়ে সরকারী বেসরকারী বাঙ্গালী কর্মচারীরা তখন পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অমান্য করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলছিল। আমরা সবাই তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছিলাম। এদিকে গোলটেবিল বৈঠক চলছিল রমনা গার্ডেনের পাশের সুরম্য ভবনটিতে। ...
>
> আমি তখন ঢাকার মগবাজার বেতার অফিসে চাকরি করি। বলাবাহুল্য এই বেতার অফিসটির মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ হতো।
>
> আমরা গুজব শুনতাম। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার সুযোগ ছিল না। আমি আর আমার দুই বন্ধু প্রায় প্রতিদিন বিকেলে শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পর্যবেক্ষণ করতে যেতাম। ...
>
> টেলি যোগাযোগ দপ্তরে চাকরি সুবাদে রমনা টেলিযোগাযোগ কেন্দ্রের আমাদের কোন এক বন্ধু আড়ি পেতে শুনে নেয় দুই পাকিস্তানি জেনারেলের টেলিফোন আলোচনা। আলোচনা ছিল ২৫শে মার্চের রাতে আর্মি মুভমেন্ট। আমরাও খবরটা পেয়ে গেলাম। আরো জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধুর কানেও খবরটা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তাই বিকেলে আর্মি মুভমেন্ট সত্যিকার হবে কিনা, পাকিস্তানিরা কীভাবে এর প্রস্তুতি নিচ্ছে তা দেখার জন্য আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দেখতে বেরুলাম বিকেলে। দেখলাম প্রচুর পাকিস্তানি সৈন্য সবকটি জায়গায়। ...
>
> সন্ধ্যার পরপরই বাসায় ফিরে এসেছি। আমার বাসাটি ছিল মগবাজার ওয়ারলেস অফিসের ফটকের লাগোয়া। সন্ধ্যা শিফটে অফিসের কর্মচারীরা এসেছে কিনা দেখার জন্য অফিসে গেলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে। ...
>
> ওদেরকে একথা বলে আমি বাইরে মালিবাগ টেলিভিশন রোডে অবস্থা দেখার জন্য এলাম। বাইরে তখন নিকশ কালো আঁধার। সারা শহরে বিদ্যুৎ নেই। ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অগুনতি লোকজন মালিবাগ টেলিভিশন রাস্তা খুঁড়ে ব্যারিকেড তৈরি করছিল। কোন কোন রাস্তায় ইট, গাছের গুঁড়ি, লোহা লক্কর, ভাঙ্গা গাড়ী ইত্যাদি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছিল হানাদার বাহিনীর অগ্রগতিকে রুখে দাঁড়াবার জন্য। আমি রামপুরা টেলিভিশন রোড ধরে মালিবাগ মোড় হয়ে ফিরে এলাম। দেখলাম অসংখ্য মানুষ স্থানে স্থানে ব্যারিকেড গড়ে তোলছে।
>
> রাস্তার দিকে ঘরের দরজায় একটা প্রকাণ্ড তালা ঝুলিয়ে দিলাম। রাত সাড়ে দশটা পৌনে ১১টা নাগাদ গুলির আওয়াজ ও বহ্নিশিখা দেখতে পেলাম। মনে হল তেজগাঁ এলাকায় আগুন লেগেছে। ক্রমশ গুলির আওয়াজ বাড়তে লাগল, আগুনের লেলিহান শেখা নজরে পড়তে লাগল। একজন অপারেটর অফিস ছেড়ে আমার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। বাসার ভেতরের আঙ্গিনায় দাড়িয়ে আমরা উপলব্ধি করছিলাম বর্বর বাহিনীর তাণ্ডব লীলা। দূর থেকে আমরা বিস্তীর্ণ এলাকার অগ্নিশিখা, কানফাটা গুলির আওয়াজ আর মাথার উপর দিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে যেতে দেখতে লাগলাম। রাত্রি বারোটা কি একটা হবে হঠাৎ করে টেলিফোন যন্ত্রটি অসাড় হয়ে গেল। শুনতে পেলাম মেশিন গানের অনবরত গুলির ছোড়ার আওয়াজ, মর্টার ছোড়ার কানফাটা আওয়াজ। ইতিমধ্যে বর্বর বাহিনী মগবাজার চৌরাস্তা পার হয়ে রাস্তার পাশের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে মালিবাগ মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল। কালো রাত্রির নিকষ আঁধারকে ভেদ করতে বর্বর বাহিনী ব্যবহার করছিল এক ধরনের হাওয়াই বোমা। এটা উপরে ছোড়া হতো, এক ১৫০ গজ উপরে উঠে এটা

ফেটে গেলে সারা এলাকা আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে পড়তো। এত আলো যে মনে হতো এ আলোতে দুর্বা ঘাসে একটা সুঁই হারিয়ে গেলেও তা খোঁজে বের করা যাবে। ওরা অবিরাম মর্টার থেকে সেল ছুড়ছিল মেশিনগানের গুলি ছুড়ছিল। কদাচিৎ এদের জবাব থ্রি নট থ্রিতে দেয়া হচ্ছিল। বর্বর বাহিনী মগবাজার এলাকা পৌঁছলে থ্রি নট থ্রির গুলির সংখ্যা বেড়ে গেলো। পরে শুনেছি রাজার (বাগ) পুলিশ লাইনের কিছু সংখ্যক পুলিশ আড়াল থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়েই এদের বেশ কিছু সংখ্যককে সাবাড় করেছিল। বর্বর বাহিনী আর্মারড কারে চেপে মর্টার শেল ও মেশিনগানের গুলি ছুড়ে ছুড়ে রাজার (বাগ) পুলিশ লাইনের কাছাকাছি পৌঁছলে বীর বাঙ্গালী পুলিশ থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়েই এদের মোকাবিলা করে। বর্বর বাহিনীর বেশ কিছু জোয়ান ও অফিসার পুলিশের গুলিতে ধরাশায়ী হয়। অসংখ্য থ্রি নট থ্রির গুলির আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম।

রাত আড়াইটায় এ নারকীয় গোলাগুলির মাঝে আমার মনে হলো কয়েকটা বেবী টেক্সী যেন রাস্তা দিয়ে চলছে। আমি অবাক হয়েছিলাম এত রাতে বেবী টেক্সী এত গোলাগুলির মাঝে চালাচ্ছে কে? আসলে বুঝতে পারিনি যে এটা বেবী টেক্সীর নয়। ট্যাংকের আওয়াজ। পুলিশের মোকাবিলা করতে গিয়ে বর্বর বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং ট্যাংক বহর তলব করে। বর্বর বাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাজারবাগ আক্রমণ করলে আমাদের বীর পুলিশ বাহিনী কাবু হয়ে যায়। থ্রি নট থ্রির গুলির আওয়াজ অপেক্ষাকৃত ভাবে কম শুনা যেতে থাকে। ট্যাংকের সামনে পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ে। পুলিশের বাসের তৈরি ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দিলে বহু পুলিশ শহীদ হয়, অনেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। সকাল অবদি পুলিশ আড়াল থেকে বর্বর বাহিনীর সাথে লড়াই করে যায়। ফাঁকে ফাঁকে টুশটাশ থ্রি নট থ্রির আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

খুব ভোরে হয়তো, ভোর পাঁচটা হবে আমাদের অপারেটর ভদ্রলোক অফিসে ফেলে আসা তার চাদর আনতে গেলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। ভদ্রলোক অপারেটরকে বঙ্গবন্ধুর একটি নির্দেশ দিয়ে বলেন এটি বঙ্গবন্ধু পাঠিয়েছেন। যতশীঘ্র সম্ভব এটি বাংলাদেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। নির্দেশ নামাটি নিয়ে অপারেটর আমার কাছে ফিরে আসেন এবং এটা পাঠানো হবে কিনা এ ব্যাপারে আমার নির্দেশ চান। কে এই নির্দেশ নামাটি দিয়ে গিয়েছিল জানি না। নির্দেশটি অবিকল মনেও আজ করতে পারছি না। তবে নির্দেশটির ভাবার্থ ছিল বর্বর পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে পিল খানা ও রাজারবাগে বহু বিডি আর, পুলিশ এবং বহু জায়গায় অসংখ্য লোক হত্যা করেছে। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনী যথা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ,জনতা যেন বর্বর বাহিনীর মোকাবিলা করে। নির্দেশটি সমস্ত থানায়, জেলায়, মহকুমায়, আর্মি, ইপিআর পুলিশ, আনসার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ ছিল। ঢাকা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দিলেও ভাগ্যক্রমে মগবাজার ওয়ারলেস অফিসে বর্বর বাহিনী ওই রাতে বা তার পর দিনও হানা দেয়নি। তাই আমরা এবং আমি নিজে এ নির্দেশটি যেখানে যেখানে সম্ভব পৌঁছে দিয়েছিলাম। যাকেই দিয়েছিলাম তাকেই অনুরোধ করেছিলাম এটা যেন আরো সর্বত্র ছড়িয়ে ও জানিয়ে দেয়া হয়। পরে শুনেছি এ খবর অনেক জায়গায় পৌঁছে ছিল।

রক্তাক্ত স্বাধীনতায় আমার রক্তের অবদান নেই। গলার স্বরে, মুখের বোলে সামান্য যেটুকু করেছি তাতেই আমার গর্ব।

ট্রান্সমিটার ও ওয়্যারলেসে পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতাদের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে

চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসার ৮০৭৮৫ নম্বরে ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে আসা টেলিফোন কলে ঐতিহাসিক বার্তাটি পেয়ে যান তাঁর স্ত্রী, মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ডা. নুরুন্নাহার জহুর। তিনি রাত ৩টার দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডুর সলিমপুর আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ওয়্যারলেস স্টেশনের কোস্টাল অপারেশনাল বিভাগের কর্মীদের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেন। আর রাতের মধ্যেই জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসায় আসা বার্তাটি ওই রাতেই হাজারি গলির বিনোদা ভবনে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে সাইক্লোস্টাইল মেশিনে কপি করে কর্মীদের কাছে পৌঁছানো হয়। পরে আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরীর পাথরঘাটার বাসার সাইক্লোস্টাইল মেশিনেও বার্তাটি কপি করে বিলিয়ে দেওয়া হয়। ২৬শে মার্চ ভোরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি হাতে পেয়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মী, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত বাঙালি কর্মীরা কেউ মাইকযোগে তা প্রচার করেন, কেউ আবার সাইক্লোস্টাইল করে ছড়িয়ে দেন।

সলিমপুর আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ওয়্যারলেস স্টেশনের কোস্টাল অপারেশনাল বিভাগের টেলিফোন রেডিও টেকনিশিয়ান জালাল আহমেদ বার্তাটি লিখে নিয়েছিলেন। স্টেশনের কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সমুদ্রে অবস্থিত ইন্ডিয়ান জাহাজ 'ভিভি গিরি', অন্য বিদেশি জাহাজ 'সালভিটা', ইউনাইটেড নেশনের জাহাজ 'মিনি লা-ট্রিয়া'সহ বেশ কয়েকটি বিদেশি জাহাজ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নামে কলকাতা বেতারের উদ্দেশে ডুপ্লেক্স চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন, যা ২৬শে মার্চ সকাল প্রায় ৭টা-৮টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে, এমনকি বহির্বিশ্বেও। ২৭শে মার্চ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় বলা হয়, "২৬শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান দুটি বার্তা সম্প্রচার করেছেন। একটি অজ্ঞাত রেডিও স্টেশন থেকে বিশ্বের কাছে পাঠানো এক বার্তায় আওয়ামী লীগ নেতা (শেখ মুজিব) ঘোষণা দিয়েছেন যে 'শত্রু' আঘাত হেনেছে এবং জনগণ বীরের মতো লড়াই করছে। বার্তাটি কলকাতা থেকে শোনা হয়েছে। রেডিও স্টেশনটি নিজেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। শিলং থেকে শোনা স্টেশনটির পরবর্তী সম্প্রচারে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।"

২৬শে মার্চ দুপুর পৌনে ২টার সময় চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সর্বপ্রথম প্রচার করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান। ঘোষণাটি নানাভাবে প্রচারিত হয় একাধিকবার।

এভাবেই ইতিহাস সৃষ্টি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা।

নাসরীন মুস্তাফা : প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের সদস্য, nasrin.mustafa17@gmail.com

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

কালপঞ্জির ইতিহাসে বিশ্ব দিবসের অভাব নেই। বিশ্ব আবহাওয়া দিবস তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে এই দিবসটি কবে, কখন উপস্থিত হয় কিংবা ঢাকঢোল পিটিয়ে কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয়– তা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে অজ্ঞাত। আমাদের প্রতিদিনের জীবনাচরণের সঙ্গে মিশে আছে আবহাওয়া বা জলবায়ুর সম্পর্ক।

২৩শে মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। প্রতিবছর বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ১৯১টি সদস্যরাষ্ট্র কিংবা অঞ্চলসমূহ দিবসটি পালন করে থাকে। এই সংস্থাটি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রধান কাজ হলো বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় সহায়তা দেওয়া এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রযুক্তি সরবরাহ করে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলা।

আমরা আজকাল মুঠোফোন, বেতার, টিভি, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আবহাওয়ার সংবাদ জ্ঞাত হই। এক্ষেত্রে এখন প্রধান ভূমিকা পালন করছে মহাশূন্যে আমাদের প্রেরিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। দশ-পনেরো বছর আগে আবহাওয়ার খবর সংগ্রহের জন্য আমেরিকার নাসার সাহায্য নিতে হতো। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ উপকূলে সেই প্রলয়ংকরী টর্নেডোতে ১০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এই টর্নেডোর আগাম খবর কিংবা পরের খবর আমরা জানতে পারি ২/৩ দিন পরে। এখন এ সংবাদ অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। কারণ একটি টাচ মুঠোফোন দিয়ে আমরা ঘরের চালের ওপর মেঘের ছায়া পড়েছে কি না, তা দেখতে পারি। গোটা বিশ্বকেও দেখা যায় কিংবা পর্যবেক্ষণ করা যায় বিজ্ঞানের বদৌলতে।

কিন্তু ৫০ বছর আগে আমাদের আবহাওয়ার স্বরূপ কিংবা জলবায়ুর পরিবর্তনের তথ্যাদি কীভাবে সরবরাহ করা হতো, তা জেনে নেওয়া যাক। সরকারি পর্যায়ে আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয়গুলো তদারকি করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তর– যার নাম আবহাওয়া অধিদপ্তর। আমরা সবাই জানি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়টি প্রধানমন্ত্রীর অধীন। এই অধিদপ্তরটি আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। এখানে রয়েছে আবহাওয়া বিজ্ঞানী তথা আবহাওয়াবিদগণ। তারাই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উপগ্রহ প্রেরিত দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেশন করেন। যা আমরা দুর্যোগের সময় পাই সকল প্রচারমাধ্যমে।

যখন রাডার ছিল না, বীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, প্লেন, রকেট ও উপগ্রহ কল্পনার বাইরে অর্থাৎ বিজ্ঞানের আধুনিক জয়যাত্রা শুরুর পর্যায়ে, তখন বিশ্বের মানুষ কীভাবে চলত? তারা কীভাবে প্রকৃতিকে নির্ভর করে জীবনধারণ করত? তখন কিন্তু প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই মানুষ বেঁচে থাকত। বলছি আমাদের এই জনপদের কথা।

তার আগে বলে নেওয়া ভালো– বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর ও মহাসাগর। দক্ষিণের জেলাগুলোর উপকূলীয় অঞ্চল ৮/১০টি জেলাকে ঘিরে। এখানে প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়-টর্নেডো আঘাত হানে। ভূমিধস-জলোচ্ছ্বাস তো রয়েছেই। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অতিবন্যা, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, দাবদাহ, কালবৈশাখি, ভূমিকম্প, সাগর-মহাসাগরের নিম্নচাপ ও জলবায়ুর হঠাৎ পরিবর্তন অন্যতম।

যখন আবহাওয়া প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি, তখন এ অঞ্চলের একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী, যে-কোনো দিন বিদ্যালয়ে যাননি, তিনি প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে জল-হাওয়ার খবর দিতেন। তাঁর প্রযুক্তির মাধ্যম ছিল– চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, নদনদী, আকাশ, মেঘ-মেঘালি ও বাতাস। তিনি মুখে মুখে শোলক বানিয়ে কৃষি জনপদে প্রচার করতেন। সেগুলো অনুসরণ করেই সেকালের বাংলার ঘরগেরস্থি চলত। তাঁর নাম খনা ওরফে লীলাবতী। রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দু-একটি শোলক এরকম–

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ।

মাঘে উড়িল উগনি
বৃষ্টি হবে ফাল্গুনি।

আসমান ফাঁড়াফাঁড়া
বাতাস বহে চৌধারা।

আশ্বিনের কুড়ি
পানি হয় বুড়ি।

খনার এসব বার্তা এখনও গ্রামবাংলায় প্রচলিত। এগুলোয় কিন্তু মৌসুমি আবহাওয়ার বার্তা রয়েছে। অনেক কৃষক চাষাবাদে খনার বচন মেনে চলেন। আর এখনতো উপগ্রহের যুগ। অর্ধশতাধিক বেতার-টিভি। আগে ছিল আমাদের দুটি প্রচারকেন্দ্র– বেতার ও টিভি। পত্রিকা ছিল কিন্তু এতে আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেশন করা হতো না। দিনে একবার বাংলাদেশ টেলিভিশন আর রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বেতার দিনেরাতে তিনবার কেন্দ্র খুলে আবহাওয়ার সংবাদ চার বার প্রচার করত। এক্ষেত্রে বেতারের ভূমিকাই মুখ্য ছিল। সকালের অধিবেশন, দুপুরের অধিবেশন ও সন্ধ্যের অধিবেশনে বিকালে এবং অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে আবহাওয়া বার্তা জানিয়ে দিত, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। আর দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের সাগর-মহাসাগরে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আবহাওয়ার সংকেতগুলো প্রচারের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা রেডিওর অধিবেশন চলত। এক্ষেত্রে টিভির প্রচারণা ছিল সীমিত। এখন বেসরকারি রেডিও-টিভির অভাব নেই। বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি বেতারে সীমিত দূরত্বের এফ. এম. চ্যানেলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ বেতার ছাড়া অন্য কেন্দ্রগুলো দুর্যোগকালীন আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রেরিত সংবাদ প্রচারে তৎপর হতে দেখা যায় না।

দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে আবহাওয়ার নানারূপ। ছয়টি ঋতুর ছয়টি আদল। তাই কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে শুধু ঘূর্ণিঝড়-টর্নেডোই নয়, পৃথিবীর শূন্যমণ্ডলে মেঘ, বিদ্যুৎ, জলের নিম্নচাপ, বৃষ্টি, কুয়াশা ও শিশিরের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়েই আবহাওয়ার নানারূপ। তবে আবহাওয়ার বিকট রূপ আমরা দেখতে পাই ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে। মূলত ঘনমণ্ডল, শান্তমণ্ডল ও আয়নমণ্ডলের কারণেই গতি-প্রকৃতি। আমরা অনেকেই জানি না, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে বায়ু কিংবা আবহাওয়া মণ্ডলের কোনো অস্তিত্ব নেই। মূলত আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভূমণ্ডলকে ঘিরে।

আগারগাঁয়ে অবস্থিত আমাদের আবহাওয়া অধিদপ্তরটি বিশ্বমানের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর 'বিএমডি আবহাওয়া অ্যাপ' উদ্বোধন করে প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়ন করেন এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য। বর্তমানে এটির ছয়টি রাডার স্টেশন ও ছয়টি অত্যাধুনিক ব্রডব্যান্ড সিসমোমিটার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক সমগ্র দেশব্যাপী। কখনো ভারতের কলকাতাস্থ আলীপুর আবহাওয়া দপ্তর ঐ বঙ্গের আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেশনে আমাদের বরাত প্রদান করে।

এবারে বলি অধিদপ্তরটির পূর্বকথা। ১৮৬৭ সালে যশোর ও নারায়ণগঞ্জে দুটি 'আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার' স্থাপনের মাধ্যমে এই সার্ভিসের সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮২ সালে আবহাওয়া দপ্তরটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান। এটির প্রধান কর্মকাণ্ড হলো: নির্দিষ্ট সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান, কৃষি-নিরাপত্তা, নৌ ও বিমান চলাচলে অধিক সংবাদ প্রেরণ ও সতর্কবাণী ঘোষণা। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটি আরও যে সকল সেবা প্রদান করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- বিমান অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা
- সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস
- কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস
- কালবৈশাখির পূর্বাভাস
- ভূমিকম্প ও সুনামি সতর্কবার্তা
- দৈনন্দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- অভ্যন্তরীণ নৌচলাচলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা
- জলবায়ু ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাবলি
- ভিভিআইপিদের চলাচলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- শৈত্যপ্রবাহ ও খরার পূর্বাভাস
- অনলাইনে ডাটা ক্রয়
- ভারী বর্ষণজনিত ভূমিধসের পূর্বাভাস
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচি
- পবিত্র রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের একটি প্রচারপুস্তিকায় কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীনস্থ অফিস/পর্যবেক্ষণাগারগুলো দুটি আঞ্চলিক অফিস, ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র, ঢাকা এবং আবহাওয়া ও ভূপ্রাকৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম-এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল, উন্নত যন্ত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পালন করে আসছে। ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জাতীয় পূর্বাভাস কেন্দ্র হিসেবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান করে আসছে। দুটি আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও আবহাওয়া অফিসের রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু মহাশাখা, ওয়ার্কশপ ও ল্যাবরেটরি, প্রশাসনিক মহাশাখা, পরিকল্পনা মহাশাখা, সিনপটিক মহাশাখা এবং আন্তর্জাতিক মহাশাখা। জলবায়ুর পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সার্বক্ষণিক সরকার ও জনগণকে সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দক্ষ জনবলের সংযোজন ও যন্ত্রপাতিসমূহের ধারাবাহিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রয়োজন আবহাওয়ার সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। এজন্য আবহাওয়া অফিসের রয়েছে– প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ৪২টি, পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার ১০টি, রেডিও সাউন্ডিং পর্যবেক্ষণাগার ৪টি, কৃষি পর্যবেক্ষণাগার ১৭টি, রাডার স্টেশন ৫টি (৩টি ডপলার ও ২টি প্রথাগত) এবং ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণাগার ১০টি।

এছাড়াও এই অধিদপ্তরটি প্রতিবছর ২৩শে মার্চ শোভাযাত্রাসহ কার্যালয়ে সুধী সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। এতে বাংলাদেশের সাংবাদিক, অধ্যাপক, কৃষিবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, গবেষক ও শব্দসৈনিক ও শিল্পীবৃন্দ যোগ দেন। বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে বইমেলায় ২/৩ বছর আগে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করে গ্রন্থপ্রেমিক ও স্টলস্থাপনকারীদের মন জয় করেছিল এবং পর্যবেক্ষণাগারের আগাম বার্তা মোতাবেক ঠিক সময়ে ঝড়-বৃষ্টি হলে সকলের দৃষ্টি কাড়ে অধিদপ্তরটির স্টলটি।

প্রতিমুহূর্তে আবহাওয়া জানার জন্য বিএমডি ওয়েদার অ্যাপ ব্যবহার করা যায়। এই অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোর থেকে স্মার্ট ফোনের গ্রাহকরা ডাউনলোড করতে পারবেন অতিসহজে। শুধু তাই নয়, খবরের পাশাপাশি ফোনের স্ক্রিনে ডপলার রাডার এবং আবহাওয়া স্যাটেলাইট তথ্যও দেখা যাবে। এটি দেশের ৪২টি স্থানে বসানো এবং স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া সরঞ্জামের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

রোদ ঝলমলে ফর্সা আকাশ, অসীম দিগন্ত কিংবা আষাঢ়-শ্রাবণের টিনের চালে বৃষ্টিপাত, কাঁথা মোড়ানো শীত অথবা বসন্তের দখিনা হাওয়া ও প্রকৃতির সৃষ্ট দুর্যোগ– বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চিরপরিচিত। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আবহাওয়ার সংকেত জ্ঞাত হলেই আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটে যান জানমাল নিয়ে। দুর্যোগ প্রশমন, প্রতিরোধ ও প্রাণের নিরাপত্তার জন্য রয়েছে অন্য মন্ত্রণালয়। স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রমও চোখে পড়ে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার মূল কাজটিই আবহাওয়া অধিদপ্তরের। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার জন্য বিনাখরচে ১০৯০ নম্বরে ফোন করা যায়।

তথ্যসূত্র: আবহাওয়ার তথ্যপ্রযুক্তি পুস্তিকা *প্রতিশ্রুতি*, বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০১৬

খালেক বিন জয়েনউদদীন: সাহিত্যিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক

ড. মো. আব্দুস সামাদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ ১৯৭১-এর ভাষণটি ইতিহাসে অনন্য, যা আজ 'বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ' (World's Documentary Heritage)। পৃথিবীর অধিকারবঞ্চিত বাঙালির শত–সহস্র বছরের সংগুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উচ্চারণে সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। অমোঘ তীক্ষ্ণতা, সাবলীল ভঙ্গি, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু গভীরভাবে অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া ভাষণের মূল কথা ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস ও অধিকারহীনতার বিষয়। এতে দীপ্র হয়ে উঠেছে– পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমেই এ অবস্থা থেকে বাঙালির সার্বিক মুক্তি সম্ভব; এবং এই বক্তব্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা-শৈলীর অতুলনীয় ভঙ্গিতে কখনো আবেগ, কখনো যুক্তি, কখনো প্রশ্ন বা ইচ্ছাকৃত জোরালো পুনরুক্তির মাধ্যমে সোচ্চার করে তুলেছেন; কিংবা বিশেষ স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে সংগত কারণেই কৌশলময় ভাষা বা ইঙ্গিতে শ্রোতাদের মনে গেথে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এক বিশাল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রদান করা হয়। যে সময় বাংলাদেশের বাঙালিরা তাদের স্বাধীনতা, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এক ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এমনি সময়েই বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সৃষ্টি করল এক নতুন দিগন্ত।

বাঙালি জাতির আপোশহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যেসব পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বন করে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সফল পরিসমাপ্তির রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশলের এক চমৎকার রূপরেখা তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। এই ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করার কৌশল এবং তাতে সাফল্য লাভের দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। আইয়ুব খান সামরিক শাসনের জাঁতাকলে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল বাঙালির প্রতিবাদী কণ্ঠ। বঙ্গবন্ধু ততদিনে বাঙালি নেতৃত্বের পুরোধা হয়ে উঠেছেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা তিনি। আত্ম-অধিকারের প্রশ্নে ছয় দফা নিয়ে এলেন। পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল এক অনিবার্য পরিণতি। বিপুল জনসমর্থন ছয় দফা আন্দোলনকে শানিত করে তুলল।

পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস পড়ে দেখার প্রাজ্ঞ আচরণ করতে পারল না। দমননীতির ভুল পথেই পা বাড়াল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি নিয়ে এল। কিন্তু ততদিনে বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে গেছে। পরীক্ষিত হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব। প্রবল আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো আইয়ুব সরকার। গণ-অভ্যুত্থানের প্রচণ্ডতা বাধ্য করল আইয়ুব খানকে পদত্যাগ করতে। এ সময় পর্যন্ত কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শানিত হয়নি। তাই ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এ নির্বাচন দিলে এদেশের মানুষ বিপুল উৎসাহে নির্বাচনে অংশ নেয়। নিরঙ্কুশ বিজয় আসে আওয়ামী লীগের পক্ষে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে যখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্বাধিকারের আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বাঙালি মানসিকভাবে পরিত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল বিজয় অর্জন করার পর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা স্বৈরাচারী পন্থায় সংখ্যাগুরু বাঙালির এই নির্বাচনি বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের অধিকারকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত হয় এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালিকে চিরতরে দাবিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা শুরু করে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। গোটা পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক সরকার-কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও নেতৃত্বে একটি বিকল্প নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং এর পেছনে বাংলার মানুষের সমর্থন একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে সরকার ও দেশ পরিচালনার এক জনপ্রিয় সনদে পরিণত করে। আর এর মধ্য দিয়ে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই অসহযোগ আন্দোলন এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার নির্দেশমালার গুরুত্ব এখানে যে– গোটা বাংলাদেশের মানুষ বিপুলভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল, এর মাধ্যমে সরকারি প্রশাসন চলছিল এবং বাংলার জনগণ অঙ্গীকারদীপ্ত প্রত্যয়ে এর জন্যে জান বাজি রেখেছিল। পূর্ব বাংলায় শুধু ক্যান্টনমেন্টসমূহেই পাকিস্তানের কিছুটা কর্তৃত্ব টিকে ছিল। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্বের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব বহুমাত্রিক। বিপুল মানুষের আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ এবং প্রবল শত্রুপক্ষের মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে ঐ ভাষণ দিতে হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার অপেক্ষায় অস্থির প্রহর গুণে বাঙালি। ৭ই মার্চের সে সময়ের রেসকোর্সের প্রতি সবার দৃষ্টি আর মন আছড়ে পড়ে। জনগণের প্রবল চাপ ও প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। সংগ্রামী বাঙালির মিছিল জড় হয়ে রেসকোর্স ছাড়িয়ে প্রায় পুরো ঢাকা ছড়িয়ে পড়ে। দৃঢ়চিত্তে বঙ্গবন্ধু বজ্রকঠিন অথচ কাব্যিকভাবে তাঁর অসাধারণ ভাষণটি দিলেন।

৭ই মার্চের সংক্ষিপ্ত ভাষণে একদিকে যেমন তিনি বাঙালির নিকটতম সময়ের সংগ্রামী ইতিহাস জানালেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন, তেমনি বললেন সেই ক্ষণে আমাদের করণীয় কী– যার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। কঠিন এক সংকট মুহূর্তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভয়-ত্রাস এবং আশা ও সম্ভাবনায় উদ্বেল সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে এক জাদুকরী ভাষণে রাজনৈতিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে এনে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ অঙ্গীকারদীপ্ত মুক্তিসেনানীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ লক্ষ লক্ষ জনতাকে বঙ্গবন্ধু জানান,

> ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম?

বাংলার মানুষকে একাত্ম করার জন্য এবং নিজ ক্যারিশমানুযায়ী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে নিজ কাঁধে নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

বাংলার মানুষ সেই মুক্তি পায়নি। উলটো তারা শিকার হয়েছে বঞ্চনার, অত্যাচারের আর হতাশার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝতে চায়নি আমাদের স্বপ্নকে বাস্তব করতে দেয়নি। তাই বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিকভাবে জানিয়ে দিলেন, 'আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে'।

নিজের জীবন, নিজের স্বার্থ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তিনি জনগণের অধিকার আদায় করতে চান। তিনি বললেন,

> আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ... ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।

এই বক্তব্যে তিনি 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং বলে দিয়েছেন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে, সেজন্য কোন অফিস বন্ধ থাকবে তা যেমন বলেছেন তেমনি আটাশ তারিখে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বলেছেন। এই বক্তব্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আছে। সেই অধিকার আদায়ের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে তিনি তদানীন্তন পূর্ব বাংলার জীবন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন এবং সমগ্র জনতার স্বার্থের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

> আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। ... তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

পাকিস্তানি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই বক্তব্য গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সাম্প্রতিক ইতিহাস, বাঙালির জীবনে কী করণীয় তা স্পষ্ট করে জানালেন। তিনি জানেন জনগণ তাঁর কাছ থেকে দিক নির্দেশনা চাচ্ছেন। এখন আমাদের কী করতে হবে? কী করা দরকার? কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক দূরদর্শী ব্যক্তি, বিচক্ষণ এবং সাবধানী। তাই চূড়ান্ত সংগ্রামে যাওয়ার আগে চাই প্রস্তুতি আর তাই তিনি শেষ করলেন, 'কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন'। 'প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

এভাবে ৭ই মার্চের ভাষণ সকল পক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় প্রশাসন চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। এই ভাষণের পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধের

প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালি। শ্রমিকেরা চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। গ্রামগঞ্জে, পাড়ায়-মহল্লায় যুবকরা ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই মার্চের ভাষণের নির্দেশনা বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন হয়ে রইল। শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, আজ এই ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অমূল্য সংযোজন ও ঐতিহ্য দলিল হয়ে উঠেছে। আজ মুজিবের ভাষণ বিশ্বে আলোচিত ও পঠিত হচ্ছে মানব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল। তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-শুভানুধ্যায়ী নয়, বাম রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বস্তরে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা (Unilateral Declaration of Independence-UDI) দেননি। তাতে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হতেন। ফলে আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্ব জনমত দুইই তাঁর বিপক্ষে চলে যেত। তাই রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও মেধাবী কৌশলবিদ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েও তার কার্যকারিতাকে তিনি শর্তসাপেক্ষ করে রাখলেন। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাষণে বলেন–

> অ্যাসেম্বলি কল করেছে।... আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' উইদড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।

এমনকি সমকালীন সময়েও বিজ্ঞব্যক্তিরা উপলব্ধি করেছিলেন এই ভাষণ বাংলার আর পৃথিবীর ইতিহাসে কী বড়ো এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৭ই মার্চের ভাষণকে মহাকাব্য হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, '৭ই মার্চ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটল এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল'। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এই ভাষণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। কেউ কেউ এ ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস' (১৮৬৩), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উইনস্টন চার্চিলের একটি ভাষণের সঙ্গে বা মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' (১৯৬৩) ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণ একটি অনন্য দলিল এতে একদিকে আছে মুক্তির প্রেরণা। অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা'। কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছেন, '৭ই মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুধু ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল। এ দলিল শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা'। ১৯৭১ সালেই বিবিসি মন্তব্য করে, 'পৃথিবীর ইতিহাসে জন আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনীয় এই ভাষণটি। যেখানে তিনি একাধারে বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়ক'। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে *টাইম ম্যাগাজিন* লিখেছে, 'শেখ মুজিব ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এই ভাষণে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলও ছিল'।

'রাজনীতির কবি' ও 'প্রকৌশলী'– বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি গঠনে কৌশল, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস থেকে নেওয়া শিক্ষা, সময়জ্ঞান ও শব্দচয়নের মুনশিয়ানা আছে। বাঙালিকে 'আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষ', 'আমার মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পূর্ব বাংলার অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য আজীবন আপোশহীন সংগ্রাম, জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে জনগণের একেবারে হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যাওয়া তাঁর মতো নেতার পক্ষেই এই ভাষায় শ্রোতাদের সম্বোধন করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ স্বশাসনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মানুষকে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং তীব্র অধিকার সচেতন ও লড়াকু মানসিকতাসম্পন্ন করার জন্য সুদক্ষ বাগ্মীরা কতগুলো কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তা করেছেন পরিচ্ছন্ন দক্ষতা ও সুগভীর আন্তরিকতায়।

বাঙালির জন্য এটি সর্ব সময়ের সর্বকালীন পথনির্দেশক। তাই এর চর্চা-এর গুরুত্ব অনুধাবন করা আমাদের প্রতিনিয়ত প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাই আমাদের ইতিহাসের এক অনুপ্রেরণা, যুগ যুগ ধরে এটি স্মরণ রেখে স্বাধীন বাংলাদেশি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারি তাই হোক আমাদের আজকের সবচেয়ে দৃঢ়প্রত্যয়। কোনো দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তন-প্রক্রিয়ার বিপুল মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার চাপ ও বিদ্যমান ঘটনাপ্রবাহের মিথস্ক্রিয়া কোনো দূরদর্শী ও গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাকে মূলধারার মুখপাত্র বা মুখ্য চরিত্র করে তোলে; অথবা কোনো দমিত, দলিত, নিগৃহীত জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্যারিশম্যাটিক মূল নেতাই জনগণের মানস-চেতনার স্তর ও বাস্তবিক ভেতর তাগিদের সঙ্গে নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস-ধারণা-বিবেচনা ও সময়জ্ঞানকে অন্বিত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছিল।

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে, অসংখ্য বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে স্বাধীনতার যে প্রত্যাশাটি উন্মুখ হয়ে উঠেছে, তাকে ভাষা দিয়েছেন এবং এই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা এবং এই সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সঙ্গে একটা জাতি গঠন প্রক্রিয়ার পূর্ণতা এবং জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ও বিপুল আত্মত্যাগের ইতিহাস যুক্ত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলেই, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও বাঙালি জাতির পিতা। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচারে বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ গোটা বিশ্বেই তুলনারহিত।

ড. মো. আব্দুস সামাদ: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার বাংলাদেশ

ড. শিহাব শাহরিয়ার

রক্তসিঁড়ি থেকে রক্তনদী

বাঙালির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক পুরোনো। বাঙালি জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকা পড়েছিল জীবন। শোষণ-শাসন, নিপীড়ন-নির্যাতন আর আন্দোলন-সংগ্রাম করে হাজারো বছর পার করে দিয়েছে এ জনপদের মানুষ। অবশেষে যেন মাহেন্দ্রক্ষণটি এল ৭ই মার্চ ১৯৭১। নদীমেখলা সবুজ জনভূমি থেকে উঠে এলেন এক মহান কীর্তিমান পুরুষ, যার নাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত– 'শেখ মুজিব'। কী চিরন্তন মুক্তির বাণী– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেন, "সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের" সত্যি হলো। সত্যি, আমরা স্বাধীন।

বাঙালির রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রকৃত সূতিকাগার ১৯৫২ সাল। ১৯৫২-এর রক্তসিঁড়ি বেয়েই স্বাধীনতা ও বিজয়ের মূল সূচনা হয়েছিল। ঐ থোকা থোকা নাম– রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম। বুকের রক্ত কতটুকুইবা ? সবটুকু ঢেলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও স্বাধীনতা নাম'? মায়ের জন্য, মাটির জন্য, মাতৃভূমির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে আরও বললেন, আজ থেকে এই নদী-পাখি, ফুল-ফলের গন্ধমাখা দেশে সবাই গাইবে, 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা'। তখন আমরা আমাদের মায়ের বদনখানি সূর্যালোকে দেখি– আহা কী অপূর্ব সুন্দর। আবারও গেয়ে উঠি– 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'।

সেই যে শুরু আর থামেনি বাঙালি। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১– রক্তসিঁড়ি থেকে রক্তনদী। ধাপগুলো ছিল–১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১। চূড়ান্ত বলেই যেন হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তির মরণপণ লড়াই। এই মরণপণ লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিলেন হাজার বছরের বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতা, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে।

এ নদী এমন নদী

দিনটির কথা মনে নেই। মনে আছে সময়টির কথা। সম্ভবত অগ্রহায়ণের মিঠে রোদের সকাল। সাল ১৯৭১। আমার জন্ম ১৯৬৫ সালের মার্চের কোনো ক্ষণে, আমার বয়স তখন ছিল সাড়ে ছয় বছরের মতো। আমার দাদার বয়স তখন ১০০ ছুঁই ছুঁই করছে। দাদিও ৮০ পেরিয়েছে। ঐ দিন আমরা তিন অসহায় ব্যক্তি ছাড়া যৌথ পরিবারের বাকিরা আমাদের চরখারচর গ্রাম থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী বেতমারি গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ বেতমারি গ্রামটির তিন দিকেই জলাশয়– সেখানে হানাদার বাহিনীর যাবার কোনো উপায় নেই। তারা অত প্রত্যন্ত গ্রামে যায় না, যাবে না। ঐ দিন খুব ভোরে জানা গেল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নরপশুরা আমাদের ব্রহ্মপুত্র পাড়ের নিবিড় পল্লি গ্রামে আসছে। সেই হায়েনা সৈনিকদেরকে নিয়ে আসছে জামালপুরের নান্দিনার কয়েকজন রাজাকার ও আলবদর এবং আমাদেরই গ্রামের পিস কমিটির সদস্য জমীরউদ্দীন কেরানি ও আবুল কাসেম মাস্টারের মাধ্যমে। অপরাধ– আমার মামা ও চাচা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তারাই তাদের সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। আমাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা কেন আসে? কেন যখন-তখন এসে খাওয়াদাওয়া করে আবার যুদ্ধে যায় অর্থাৎ আমার বাপ-চাচারা কেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছে?

আস্তে আস্তে গ্রামের সব মানুষই জেনে যায় খবরটা। কেউ কেউ আমার শিক্ষক বাবা শহীদুল্লাহর কাছে আসে– এই পরিস্থিতিতে কী করা যায়, পরামর্শ নিতে। আব্বা তাদেরকে বলে দেন, গ্রাম ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য অন্যত্র যাবার প্রস্তুতি নিতে। ১৯৭১ সালে আমাদের গ্রামটি এমনি একটি গ্রাম যেখানে কয়েকজন শিক্ষিত লোক ছাড়া শ্যাখ সাহেব, ৭ই মার্চের ভাষণ, আইয়ুবের পাকিস্তানি শাসন, মুক্তিযুদ্ধ এসব তেমন কিছুই বুঝে না। কেউ কেউ বলত, দ্যাশে গণ্ডগোল লাগছে। কেউ কেউ বলে, তবে শ্যাখের বেটা একখান লোক বটে– শালা পাঞ্জাবদের এবার দেখাই দিবে এক হাত ইত্যাদি। এই যে গণ্ডগোল তা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শব্দ নয়, পক্ষের শব্দ। এখন অনেক নিরক্ষর মানুষ বলে, অ্যাকুত্তরের গণ্ডগোলের সময়।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ে। দাদা, দাদি এবং আমার জন্য বাড়ির পাশে বাংকারের মতো গর্ত করে, গর্তের ভেতর পাটি বিছিয়ে সেখানে বসার ব্যবস্থা করা হয়। আর গর্তের ওপর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে আম এবং কাঁঠালের ঘন পাতাযুক্ত ডাল দিয়ে ঢেকে রাখা হবে। আমরা বেলা আনুমানিক এগারোটার দিকে খাওয়াদাওয়া করে মাটির বাংকারে ঢুকে গেলাম। বাকিরা দলে-বলে গ্রাম ছাড়তে শুরু করল। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা জানতে পারল– পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা আর আসছে না। না আসার কারণ, তারা প্রত্যন্ত গ্রামে ঢুকবে না। ঢুকলে মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণ হতে পারে। ফলে তারা মাঝপথ থেকে ফিরে যায়।

আমাদের বাড়ির সবাই ফিরে আসে এবং দাদা, দাদিও আমাকে মাটির গর্ত বা বাংকার থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। মাত্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে থেকে সূর্যের আলোতে এসে মনে হলো পৃথিবী কত সুন্দর। এই রৌদ্র-হাওয়া, মেঘমল্লার, এই নৌকা-নদী, সবুজ-শ্যামল মাটি, ফুল-পাখিদের কলরব, হা-ডু-ডু, বৌচির, তেলের পিঠা, কবুতরের ডাক, মধ্য-দুপুরে শ্যাওড়া গাছের নীচে শুকনো মচমচে পাতা পাড়ানো, হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় 'বাকবাকুম পায়রা, মাথায় দিয়ে টায়রা' মুখস্ত করা আর সন্ধ্যা রাতে মায়ের কোলে ডুলুডুলু চোখে ঘুমিয়ে পরা– আহা কী যে মধুর, কী যে প্রিয় মাটির বুক বলি কেমন করে? তখন বুঝিনি কে লিখেছে: 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'। তাহলে এমন দেশকে কেন পুড়িয়ে দেবে তারা? তারা কারা? পাকিস্তানি হায়েনারা।

আমাদের গ্রামকে একাত্তরে পুড়িয়ে দিতে পারেনি। পুরো নয় মাস আমরা যুদ্ধের অনেক কিছু দেখেছি। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আম্মার মামাতো ভাই লেবু মামা তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছে। সম্ভবত ২০ থেকে ২২ জন হবে। আম্মা-চাচিরা বড়ো বড়ো পাতিলে ভাত-তরকারি রান্না করছে। সারা রাত রান্নাবান্নার প্রস্তুতিও নিয়েছে। কিন্তু রাঁধতে সয়, বাড়তে সয় না অবস্থা অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা মামাদের পেটে এত ক্ষুধা যে, রান্না শেষ হওয়ার তর সইছে না। তাঁরা এক এক করে দেখছি আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে মুলা ক্ষেতে বেড়া টপকিয়ে যাচ্ছে আর মুলা তুলে কড়কড় করে খাচ্ছে। এসময় তাঁরা তাঁদের যোদ্ধাস্ত্রগুলো বৈঠক ঘরের সামনে রেখে দিয়েছে। আমরা ছোটোরা হাজারও কৌতূহল নিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি আর জানতে চাইছি কোনটার কী নাম। মামা এসে একটা একটা করে অস্ত্র হাতে নিয়ে তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, 'এটা লম্বা এটার নাম রাইফেল, এটা স্টেনগান, এটা কামরাঙার মতো এটা গ্রেনেড'। এরপর আমরা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলাম।

বাড়ির সামনের আঙিনায় পাটি অথবা চট বিছিয়ে দেওয়া হলো– সেখানে সবাই সারি বেঁধে বসলেন। গরম ভাত, মাছ-মাংসের তরকারি দিয়ে তাঁদেরকে খেতে দেওয়া হলো। তাঁরা খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাওয়া শেষ করে যাঁর যাঁর অস্ত্র, সে সে নিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে খোলা মাঠ ও আকাশের দিকে কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা দৌড়ে গিয়ে গুলির খোসাগুলো কুড়াবার জন্য হুমরি খেয়ে পড়লাম। পিতল রঙের আঙুলের সাইজের কয়েকটি খোসা আমরা কুড়িয়ে পেলাম। পেয়ে আমাদের মধ্যে কী যে আনন্দ, তা বুঝানো মুশকিল। খোসাগুলো বাড়িতে এনে রেখে দিলাম। এরপর শুরু হলো আমাদের বন্দুক বন্দুক খেলা।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে ছিল সারি সারি অনেকগুলো কলা গাছ। আমরা সমবয়সিরা বাড়ি থেকে দা নিয়ে কলা গাছের ডাটা কেটে সেটি দিয়ে রাইফেলের মতো বন্দুক বানিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো পজিশন নিয়ে, কখনও ক্রলিং করে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করলাম। সে এক অন্য রকম আনন্দ। স্কুলও বন্ধ। কাজেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ছাড়া আর কি-ই-বা করার আছে?

এর কিছুদিন পর। শীত পড়েছে গ্রামে। একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম আমাদের বাড়ির উত্তর পাশ দিয়ে কয়েকজন লোককে হাত বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা। আব্বা বললেন, ওরাই হচ্ছে রাজাকার। ওরাই আমাদের মতো মানুষদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে, আর হানাদাররা চোখ বেঁধে নদী অথবা ঝিলের পাড়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গুলি করে মেরে ফেলে। সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে তারা মেরেছে। শুধু মানুষ মেরেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, অসংখ্য বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আর অন্যদিকে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে যুদ্ধ করে হানাদার বাহিনীকে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত করছে। আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এত খবর কীভাবে পান?' তিনি বললেন, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বিবিসি রেডিও-র মাধ্যমে'।

একদিন আব্বা একটি রেডিও সেট কিনে আনলেন। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির উঠোনে আশপাশের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকসহ সকলেই গোল হয়ে বসে বিবিসি'র খবর শুনলাম। পরেরদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের *চরমপত্র*। আরেকদিন *আকাশবাণী*। প্রণবেশ ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর। তৈরি হলো আমাদের কান। দেখতাম খবরের সময় হলেই গ্রামের অনেক মানুষ ছুটে আসছে আমাদের বাড়িতে। খবর পরিবেশনের সময় কেউ টু শব্দ পর্যন্ত করতেন না। একসঙ্গে বসে খবর শুনতে ভালোই লাগত আমাদের।

আমার আব্বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। দেশ রাজনীতি এবং ইতিহাসের ভালোই খোঁজখবর রাখেন। একদিন শেখ সাহেব মানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি দুঃশাসনের অনেক কথাই বললেন– কিন্তু আমি ততটা বুঝিনি। বোঝার বয়সও হয়নি। তবে পাকিস্তানিরা যে খারাপ এটা কিছুটা বুঝতে পেরেছি। এদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেশকে মুক্ত করতে হবে– এমনটাই আব্বা সেদিন সবাইকে বলতে চেয়েছেন।

একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনি গুরুম গুরুম শব্দ আর দেখি বাড়ির উপর দিয়ে শাঁই শাঁই করে বিমান যাচ্ছে। ভয় পাচ্ছিলাম। আব্বা বললেন, এগুলো যুদ্ধবিমান। রাশিয়া আর ভারত আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে। তারাই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে সহায়তা দিচ্ছে। হঠাৎ পর পর তিনটা বিকট আওয়াজ পেলাম। দুই হাত দিয়ে কান বন্ধ করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম সবাই।

পরে জানা গেল তিনটি শেল ফেলা হয়েছে– জামালপুর শহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে। শেল পড়ে বিশাল পুকুর হয়ে গেছে। জামালপুর শত্রু মুক্ত হলে একদিন আব্বার কাঁধে উঠে সেই শেলপড়া পুকুর তিনটি দেখতে গিয়েছিলাম। একটি পড়েছে ক্যাম্পের পাশ ঘেঁষে। পুকুর দেখার পর ঐ ক্যাম্প দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি, অসংখ্য চিঠি, হাতঘড়ি, কাপড়চোপড়সহ অনেক পাকিস্তানি আর্মিদের জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কেউ কেউ স্তূপের ভেতর কী জানি খোঁজাখুঁজি করছে।

পড়ন্ত বিকেল সম্ভবত। আমাদের বাড়ির সামনে একটার পর একটা গুলির শব্দ হচ্ছে। সমস্বরে আওয়াজ আসছে– জয় বাংলা, জয় বাংলা। সকলেই বেরিয়ে এলাম। যাঁদের আওয়াজ, তাঁরা মামাসহ তাঁর সহযোদ্ধারা। তাঁদের হাতে স্বাধীন দেশের পতাকা। বিজয়ের আনন্দে তাঁরা উন্মাতাল। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে শত শত মানুষ যোগ দিলো। সেদিন ছিল ৭ই ডিসেম্বর। শেরপুর শত্রু মুক্ত হয়েছে মানে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেখলাম বীর যোদ্ধারা মাটিকে ভক্তি করছে, কেউ কেউ সেজদা করছে। সে এক অন্য রকম অসাধারণ দৃশ্য। বিজয়ের আনন্দে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

জেগেছিল ৭৩৫টি নদী

নদীরা ঘুমায়নি। জেগেছিল ৭৩৫টি নদী। নদীর পলিমাটির তীরবর্তী বাঙালিকে ১৯৭১ সালে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হয়েছে– জীবনের কাঠখড়। অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে– নদী নদী রক্ত। কতিপয় রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর ছাড়া সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সেই দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ৫৬ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড ব-দ্বীপ সেদিন অবরুদ্ধ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সেদিন সম্পূর্ণ সহযোগী শক্তি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশগুলো। বাংলাদেশের মিত্র শক্তি ছিল ভারত ও রাশিয়া। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দুর্ধর্ষ সেনাদের সাথে নিরস্ত্র বাঙালিদের যুদ্ধ ছিল সেদিন একটি অসম যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পাকিস্তানের কারাগারে, আর এদিকে সারা বাংলায় নির্মম হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করে, তা সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেয়। বাড়িঘর পুড়ানো, ধর্ষণ আর নির্মমভাবে নিরীহ বাঙালিকে গণহত্যা চালিয়ে শ্যামল বাংলাভূমিকে সেদিন ছারখার করে দিয়েছিল। যুদ্ধের শেষ সময়ে অর্থাৎ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে হানাদারদের পূর্ণ সহযোগিতায় দোসর রাজাকার বাহিনী জাতির শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সত্যি কঠিন। অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল দেশের। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্ষেতখামার ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর সারা দেশটি পরিণত হয়েছিল বিশাল একটি গণকবরে।

সেই ক্ষত থেকে, সেই বেদনা থেকে, সেই ধ্বংস থেকে, সেই অন্ধকার থেকে উঠে আসা কত যে কঠিন, কত যে মর্মন্তুদ, কত যে সাহসের! কিন্তু বাঙালি তার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শেষ উচ্চারণ- 'সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। কঠিনকে ভালোবেসে বাঙালি সেদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয় মাসের কারান্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেশের পবিত্র মাটিতে ফিরে এলেন স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই মহান নেতার নেতৃত্বে বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এগিয়ে এল বাঙালি জাতি। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় নরপশুর দল আন্তর্জাতিক চক্রান্তে নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির পিতাকে। শুরু হয় পুনর্বার অন্ধকার যাত্রা। ১৯৭১ ও ১৯৭৫-এর পরাজিত শক্তিরা দেশকে পিছিয়ে দিলো বহু বছর। আবারও দুঃশাসন, আবারও রক্তঝরা। দীর্ঘ বছর পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর তনয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বিচার করেছে ১৯৭৫-এর খুনিদের, বিচার করছে ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের। বিচার হবেই বাংলার মাটিতে। অপরাধীমুক্ত বাংলা হবে স্বপ্নের ভূমি।

আহা আজি কী আনন্দ

আহা আজি কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে। আজ আমরা বাঙালিরা মহান গৌরবময় স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিক্রম করলাম। এটি অবশ্যই আমাদের জন্য গর্বের, আনন্দের ও সুখের বিষয়। গর্ব এ কারণে যে, এই স্বাধীনতার জন্য শত-সহস্র বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের ভাঙতে হয়েছে পরাধীনতার দুয়ার। আমরা তা ভেঙেছি, ছিনিয়ে এনেছি রক্তখচিত লাল-সবুজের পতাকা। লাল সূর্য। আজ আমরা সার্বভৌম-স্বাধীন একটি জাতি। আমরা বিজয় এনেছি, বিজয়কে ধরে রাখব চিরদিন। আমরা বিজয়ের চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যাবো প্রগতির পথে, আলোর পথে, গণতন্ত্রের পথে, অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথে, মানবতার পথে। আমরা গড়ে তুলব স্বপ্নের সোনার আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

ড. শিহাব শাহরিয়ার: কিপার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন প্রণীত

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ৯ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) ২০২৩ বিলটি উপস্থাপন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াকৃত বিলটি উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ছাড়াই জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে প্রণীত হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি এই আইনের গেজেট প্রকাশ হয়। আইন অনুযায়ী বা 'হাট-বাজার' শব্দটি এমন কোনো স্থানকে বোঝায় যেখানে সাধারণ মানুষ কৃষিপণ্য, ফলমূল, পশু, হাঁস-মুরগি, ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, খাদ্য ও পানীয়, শিল্প পণ্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো দৈনিক ভিত্তিতে বা সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে ক্রয় ও বিক্রয় করে। ঐ স্থানে এই সকল পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত দোকানও এর অন্তর্ভুক্ত। হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন ২০২৩-এর আওতায় হাট-বাজারের সরকারি খাসজমি অবৈধভাবে দখলে রাখা অথবা যথাযথ অনুমতি ব্যতীত ঐ খাসজমির উপর কোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইন লঙ্ঘনকারীর অনধিক ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের শাস্তি হতে পারে। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ জুডিসিয়াল কোর্টের মাধ্যমে বিচারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও বিচার করা যাবে।

প্রতিবেদন: মাহবুবুর রহমান

৯ই মার্চ ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশ নেন –পিআইডি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১

অদিতি চৌধুরী

চলচ্চিত্র হচ্ছে বিনোদনের মাধ্যম, দেশের সম্পদ এবং একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটিয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে রয়েছে এর জোরালো ভূমিকা। জাতীয় জাগরণে, জনতাকে লড়াই ও বিপ্লবে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্রের রয়েছে ঐতিহাসিক ভূমিকা।

২০২১ সালে চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদান রাখায় ২৭ ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে ৯ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তুলে দেন। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পুরস্কার হিসেবে নির্বাচিত সবাইকে দেওয়া হয় ১৮ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের সোনা দিয়ে তৈরি একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা ও এককালীন সম্মানী ও সম্মাননাপত্র। আজীবন সম্মাননার জন্য ৩ লাখ, শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্য ২ লাখ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেওয়া হয় ১ লাখ টাকা। এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ১৩ সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করে। জুরি বোর্ডে যারা ছিলেন তারা হলেন– ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, নুজহাত ইয়াসমিন, মো. নজরুল ইসলাম, মো. নিজামুল কবীর, রিফফাত ফেরদৌস, মোরশেদুল ইসলাম, মকসুদ জামিল মিন্টু, পংকজ পালিত, জাহিদ হাসান, সালমা বেগম সুজাতা, মোহাম্মদ নকিব উদ্দিন খান, শ্যামল দত্ত ও মুহ. সাইফুল্লাহ। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১ অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্যসচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের পক্ষে আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত ডলি জহুর।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, শিল্পের এক অনন্য রূপ চলচ্চিত্র যা বিনোদনের পাশাপাশি সমাজ ও সময়ের বাস্তব চিত্র এবং দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে। চলচ্চিত্র মাটি ও মানুষের কথা বলে; মানুষের স্বপ্ন ও সাধনাকে সেলুলয়েডে বন্দি করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালের ২৭শে মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে ইপিএফডিসি বিল উপস্থাপন করেন, যা সে বছরের ৩রা এপ্রিল পাস হয়। জাতির পিতার এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের বিএফডিসি। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও বিনোদনমূলক কালজয়ী বাংলা চলচ্চিত্রগুলোর আবেদন ও প্রভাব আজও সমাজে বিদ্যমান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত ১৪ বছরে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি নির্মাণ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আধুনিকায়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র শিল্পের মানোন্নয়নে আমরা 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' যৌথ প্রয়োজনায় 'চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' ও 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন ২০১১' প্রণয়ন করি এবং 'চলচ্চিত্র সেন্সর আইন' ও 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন' যুগোপযোগী করি। অসচ্ছল ও দুস্থ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদেশি টিভি চ্যানেলে দেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার রোধ করা হয়েছে। এসব আইন ও নীতিগত পদক্ষেপ চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১		
আজীবন সম্মাননা পুরস্কার	ডলি জহুর ইলিয়াস কাঞ্চন	
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার	**পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম**	**পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি**
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম)	মাতিয়া বানু শুকু রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত	লাল মোরগের ঝুঁটি (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত) নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আকা রেজা গালিব	ধড় (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	কাওসার চৌধুরী	বধ্যভূমিতে একদিন (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ চলচ্চিত্র পুরস্কার	পিংকি আক্তার	টুঙ্গী পাড়ার মিয়া ভাই
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক	রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত	নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্র (যুগ্ম)	মো. সিয়াম আহমেদ মীর সাব্বির	মৃধা বনাম মৃধা রাত জাগা ফুল (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্র (যুগ্ম)	আজমেরী হক বাঁধন তাসনোভা তামান্না	রেহানা মরিয়ম নূর নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্র	এম বজলুর রহমান বাবু	নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্র	শম্পা রেজা	পদ্মাপুরান
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খল চরিত্র	মো. আব্দুল মান্নান (জয়রাজ)	লাল মোরগের ঝুঁটি (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কৌতুক চরিত্র	প্রভাষ কুমার ভট্টাচার্য্য (মিলন)	মৃধা বনাম মৃধা
শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী	আরিফা জাহিন জায়মা	রেহানা মরিয়ম নূর
শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার	জান্নাতুল মাওয়া ঝিলিক (ঝিলিক জান্নাত)	যা হারিয়ে যায়
শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক	সুজেয় শ্যাম	যৈবতী কন্যার মন (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ গায়ক	কে,এম,আব্দুল্লাহ-আল-মুর্তজা মুহিন	পদ্মাপুরান
শ্রেষ্ঠ গায়িকা	চন্দনা মজুমদার	পদ্মাপুরান
শ্রেষ্ঠ গীতিকার	প্রয়াত গাজী মাজহারুল আনোয়ার	যৈবতী কন্যার মন (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ সুরকার	সুজেয় শ্যাম	যৈবতী কন্যার মন (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার	রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত	নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার	নূরল আলম আতিক	লাল মোরগের ঝুঁটি (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা	তৌকির আহমেদ	স্কুলিঙ্গ
শ্রেষ্ঠ সম্পাদক	সামির আহমেদ	লাল মোরগের ঝুঁটি (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ শিল্পী নির্দেশক	শিহাব নূরুন নবী	নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক (দলগত)	সৈয়দ কাশেফ শাহবাজি সুমন কুমার সরকার মাজহারুল ইসলাম রাজু	লাল মোরগের ঝুঁটি (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক	শৈব তালুকদার	রেহানা মরিয়ম নূর
শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা	ইদিলা কাছরিন ফরিদ	নোনাজলের কাব্য (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)
শ্রেষ্ঠ মেক-আপ ম্যান (দলগত)	মো. ফারুখ মো. ফরহাদ রেজা (মিলন)	লাল মোরগের ঝুঁটি (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)

তিনি আরও বলেন, চলচ্চিত্র সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে এই শিল্প বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের সরকার সবসময় সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহ জোগাতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় আধুনিক সিনেমা হলসহ তথ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করা হচ্ছে। সিনেমা হলসমূহের সংস্কার ও আধুনিক যুগোপযোগী সিনেমা হল ও সিনেপ্লেক্স নির্মাণের জন্য আমাদের সরকার অল্প সুদে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বাণীতে বলেন, জাতির পিতার হাত ধরে আমাদের দেশে যে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আধুনিক চলচ্চিত্র কেন্দ্রে রূপান্তর এবং বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রের নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ও সনাতন চলচ্চিত্রগুলোকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার জন্য নির্মিত হয়েছে অত্যাধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ। চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার তাঁর বাণীতে বলেন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন, বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নির্মাণ, নগরীর সার্কিট হাউস রোডে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডসহ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তরের জন্য ১৬তলা বিশিষ্ট 'তথ্য ভবন' নির্মাণ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, সিনেমা হল নির্মাণ– এসবই চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সরকারের অঙ্গীকারেরই দৃঢ় প্রতিফলন। পাশাপাশি ৬৪টি জেলায় আধুনিক সিনেমা হলসহ তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতায় ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী হিসেবে প্রাদেশিক আইন পরিষদে তাঁর উত্থাপিত 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল' পাস হয়। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন–এফডিসি, যা দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের পথিকৃৎ। জাতির পিতার হাত ধরে আমাদের দেশে যে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আইন ও নীতিগত পদক্ষেপ আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে। যা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

অদিতি চৌধুরী: প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুঃ ছড়া-কবিতায়

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির দূত। তিনিই বাঙালির চিরকালের স্বপ্ন, আশা ও সংগ্রামের সমন্বয়ক। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির বুকে যে স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন, নিজেই তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করে গেছেন। বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণের তিনিই মহানায়ক।

ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও হৃদয়ের ভালোবাসার শক্তিতে বাঙালিকে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তার ফলস্বরূপ আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল ও অম্লান।

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ– একসূত্রে গাঁথা। বাঙালি জাতির স্বপ্ন পূরণে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নানা নির্যাতন, জেল-জুলুম, কারাবাস সহ্য করেছেন। তাঁরই কষ্টার্জিত অর্জন এই স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর নাম তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে শুধু নয়, সমগ্র জাতির মানসে চির অম্লান ও চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় তিনি অধিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় রচিত হচ্ছে হৃদয় ছোঁয়া, সাহিত্য– ছড়া, কবিতা, গান।

বর্তমান এই লেখাটিতে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ছড়া, কবিতা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস। এদেশের প্রায় সব খ্যাতিমান ছড়াকারগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা, ছড়া লিখেছেন। অগ্রজদের মধ্যে– জসীমউদদীন, সুফিয়া কামাল, রোকনুজ্জামান খান, সিকান্দার আবু জাফর, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, সুকুমার বড়ুয়া, ফজল-এ-খোদা, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, হায়াৎ মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, সুব্রত বড়ুয়া, রফিক আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, হাবীবুল্লাহ্ সিরাজী প্রমুখ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা, ছড়া লিখেছেন।

কবি জসীমউদদীন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৭০ লাইনের দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি হৃদয় দিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় লিখেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

মুজিবর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে;
বিগত দিনের যত অন্যায়, অবিচার ভরা মার;
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয় বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে,
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি
(বঙ্গবন্ধু, রচনা ১৯৭১)

কবিতাটি বিষয় বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী, পাঠকপ্রিয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শোকাবহ ঘটনা সুফিয়া কামালের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। তিনি অসাধারণ এক কবিতা রচনা করেন:

এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি
হেরিতে এখনও মানব হৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা-পিতা-বোন-ভ্রাতা।
যত অসহায় অক্ষম আর উপেক্ষিতরা সব
করুণ নয়নে হেরিছে এদেশে বিলাসের উৎসব
শূন্য উদরে সুরম্য পথে চলিতে চলিতে তারা
ভাবিছে তোমারে এদেশে আবার আসিয়া বসিল কারা?
তোমার জীবন-যৌবন ভরি সুদীর্ঘ কারাবাস
মুক্ত করিল, স্বাধীন করিল মুক্তির নিঃশ্বাস
ত্যাজিয়া মানুষ বাংলার মাটি বাংলার এ বাতাসে
তোমারই দেয়া মুক্তির বাণী জীবনের আশ্বাসে
গাহিয়া উঠিল গান
তোমার বিহনে ব্যাহত হয়েছে লক্ষ মানব প্রাণ।
(ডাকিছে তোমারে)

এ কবিতাটি বাংলার মানুষের মুখে মুখে এখন। হৃদয়বিদারক কবিতা এটি, মানুষের মনের ভাষা এতে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে এই বাংলার আকাশ-বাতাস ডাকিছে।

কবি শামসুর রাহমানের কবিতার অংশ বিশেষ:

জেল জুলুমে দিন কাটে তাঁর,
ভয় পায় না মোটে,
মুক্তি পেলে তাঁর মিছিলে
সবাই এসে জোটে।
গাছের পাতা, ধূলিকণা
বলছে অবিরাম,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
অমর তোমার নাম।
(অমর নাম)

ছড়াকার রোকনুজ্জামান খান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখলেন 'মুজিব' নামে চমৎকার একটি লেখা, যার অংশ বিশেষ:

সবুজ শ্যামল জন্মভূমি মাঠ-নদীতীর- বালুচর
সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর।
(মুজিব)

কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা:

মুজিব অর্থ আর কিছু না
মুজিব অর্থ মুক্তি
পিতার সাথে সন্তানের
না লেখা প্রেম চুক্তি।
মুজিব অর্থ আর কিছু না
মুজিব মানে শক্তি
উন্নত শির বীর বাঙালির
চিরকালের ভক্তি।
(মুজিব অর্থ)

মুজিব অর্থ মুক্তি, মুজিব মানে শক্তি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে এ কবিতায়।

কবি ফজল-এ-খোদার কবিতার অংশ বিশেষ:

জাগ্রত সত্তার মূর্ত প্রতীক
মৃত্যুর মঞ্চে বিস্ময় পথিক
মানবতা, শান্তির গেয়ে গেছে গান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)

ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া লিখলেন:

মুজিবের বুকে অস্ত্র চালিয়ে
দু'হাত রাঙিয়ে খুনে
খুনিরা অবাক আকাশে-বাতাসে
বজ্রকণ্ঠ শুনে
সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা
দ্বিগুণ জনতা আজ।
স্বদেশে-বিদেশে সবার চিত্তে
জীবন্ত মহারাজ
(বিশাল মুজিব)

বিশিষ্ট লেখক সুব্রত বড়ুয়ার 'চিরকাল এ মাটিকে ঘিরে' কবিতাটির বক্তব্য প্রধান, তার অংশ বিশেষ:

একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় একটি পতাকা
একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় একটি স্বদেশ
একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় ছিন্নপত্রে আঁকা
একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় অনির্বাণ রেশ।
(চিরকাল এ মাটিকে ঘিরে)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি-ছড়াকারগণ অনেক মর্মস্পর্শী কবিতা লিখে চলেছেন প্রতিনিয়ত। প্রায় সব কবি-ছড়াকারগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা- ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন আপন আপন মেধা-মননে। কবি আসাদ চৌধুরীর 'আমাকে দিয়েছিলে তুমি অসীম আকাশ', রফিক আজাদের 'এই সিঁড়ি', হাবীবুল্লাহ সিরাজীর 'যে তোমারই নাম', মুহম্মদ নূরুল হুদার 'টুঙ্গিপাড়ার খোকাবাবু' উল্লেখযোগ্য কবিতা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও যাদের ছড়া-কবিতায় মূর্ত হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে আছেন রফিকুল হক, রবীন্দ্র গোপ, বেবী মওদুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হুদা, শামসুল ইসলাম, আখতার হুসেন, মাহমুদউল্লাহ, ফারুক নওয়াজ, আসলাম সানী, সুজন বড়ুয়া, আমীরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান রিটন, মুস্তাফা মাসুদ, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, রুহুল আমিন বাবুল, দেলওয়ার বিন রশিদ, ইয়াফেস ওসমান, খালেক বিন জয়েনউদদীন, আহসান মালেক, রাশেদ রউফ, রহিম শাহ, শিবু কান্তি দাশ, শাহাবুদ্দিন নাগরী, আনওয়ারুল কবীর বুলু, আবু হাসান শাহরিয়ার, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, শাফিকুর রাহী, সিরাজুল ফরিদ, উৎপলকান্তি বড়ুয়া, আমিনুর রহমান সুলতান, জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ, ওয়াসিফ-এ-খোদা, রমজান মাহমুদ, প্রবীর বিকাশ সরকার, আবুল হোসেন আজাদ, রব্বানী চৌধুরী, মুহিবুর রহিম, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, বাঁধন রায়, সালেম সুলেরি, সৈয়দ আল ফারুক, বিজন বনিক, সুবীর বসাক, মো. নবী হোসেন, স ম শামসুল আলম, সামিউল হক মোল্লা, গোলাপ আমিন, মানসুর মুজাম্মিল, কামাল হোসাইন, আনজীর লিটন, মিয়া মনসফ, সৈয়দ আমির আলি, আশরাফুল মান্নান, সালেম সুলেরি, মোস্তফা মহিউদ্দিন, আবু সুফিয়ান চৌধুরী, মোসলেহ উদ্দিন বাবুল, ফারুক হোসেন, মিলন সব্যসাচী, সোহেল মল্লিক, যাযাবর মিন্টু, মামুন সারওয়ার, জসীম আল ফাহিম, বোরহান মাসুদ প্রমুখ।

স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ছড়াকার ফারুক নওয়াজ লিখলেন ছড়া 'এক মুজিবের প্রতীক্ষাতেই' তার অংশ বিশেষ:

করতে স্বাধীন একটি স্বদেশ
হয় পতাকা সবুজ লাল
এক মুজিবের প্রতীক্ষাতেই
কাটল জাতির হাজারকাল।
(এক মুজিবের প্রতীক্ষাতেই)

ছড়াকার আসলাম সানীর ছড়া:

এই প্রকৃতি আকাশ-বাতাস
সবই আছে ঠিকই,
সাগর পাহাড় নদী আছে
তারার ঝিকিমিকি
কিন্তু মাগো বলতে পারিস
শেখ মুজিবুর কই
তাঁরই আশায় আজো আমি
একলা জেগে রই।
(জাতির পিতা কই)

ছড়াকার সুজন বড়ুয়া সবসময়ই লেখায় নতুনত্ব উপহার দেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখায়ও তা লক্ষ করা যায়। যেমন:

বাংলাদেশের নাম বললেই যে নামটি আসে আগে
হাওয়া কথা বলে
নদী যায় চলে
সে নামের অনুরাগে
জাগে ঢেউ দোলা
ঝঙ্কার তোলা
সে নাম যে মহীয়ান
বঙ্গবন্ধু প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।
(বাংলাদেশের সাথে)

ছড়াকার আমিরুল ইসলাম লিখেছেন:

বজ্রকঠোর কুসুম কোমল
বিস্ময়কর শেখ মুজিব
স্মরণযোগ্য পূণ্য আত্মা
পুরুষসিংহ শেখ মুজিব।
(শেখ মুজিব)

ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছড়া:

নাম লিখে রাখলাম
ফরিদপুরের অখ্যাত এক
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম
ইতিহাসে টুঙ্গিপাড়ার
নাম লিখে রাখলাম।
এই গ্রামেরই সোনার ছেলে
নামটা মুজিবুর
যার কণ্ঠে উচ্চারিত
শেকল ভাঙ্গার সুর।
(একটি ছেলের কথা)

ছড়াকার মুস্তাফা মাসুদের ছড়া:

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি
তাঁর কাছে এই দেশের মানুষ
অশেষ ঋণে ঋণী।
বুক ভরা তাঁর ছিল ভালোবাসা
চোখের কোণে হাজার স্বপ্ন আশা
এই দুখিনী দেশ যেন হয়
ধন্যি, গরবিনী।
(বঙ্গবন্ধু)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছড়াকার দেলওয়ার বিন রশিদ লিখেছেন:

মুজিব আমার মুক্ত আকাশ
দীপ্ত আলোর রবি
মুজিব আমার যাদুর তুলি
হাজার যুগের কবি।
মুজিব আমার প্রাণের প্রদীপ
স্বপ্নে পাওয়া বীর
মুজিব আমার গর্ব গাথা
নিত্য উচ্চশির।
(মুজিব আমার স্বাধীনতা)

ছড়াকার সিরাজুল ফরিদ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ছড়ায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তার ছড়া:

কার বিদেহী আত্মা এসে
বুকের ভেতর বাঁধলো ঘর?
সবার প্রিয় জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু মুজিবর।
(বঙ্গবন্ধু)

ছড়াকার জাহাঙ্গীর আলম জাহানের ছড়ার অংশ বিশেষ:

তাঁর তুলনা তিনি
সবাই তাঁকে চিনি
মহান পুরুষ জাতির পিতা বন্ধু জানি সবার
এসো সবাই চেষ্টা করি তাঁর মতনই হবার।
স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা আর চেতনা যত
শেকল ভাঙার সাহস এবং দেশ স্বাধীনের ব্রত
তিনিই শেখান এই জাতিকে, দেন প্রেরণা তিনি
শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় আমরা তাঁকে চিনি।
(তিনি জাতির পিতা)

ছড়াকার ওয়াসিফ-এ-খোদার ছড়ার অংশ বিশেষ:

সাতই মার্চে শেখ মুজিবের
অনলবর্ষী কাব্যকথা
একাত্তরের রক্ত নদী
সাঁতরে পেলাম স্বাধীনতা।
('৫২ থেকে '৭১)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছড়া-কবিতা লেখালেখির সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁকে নিয়ে ছড়াকার-কবিগণ হৃদয়ের ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় অবিরাম লিখে চলেছেন, যার পরিধি বিশাল।

বাঙালির রাজনৈতিক, দার্শনিক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরকাল শ্রদ্ধায়- ভালোবাসায় বাংলার মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় যেমন সযতনে সতত থাকবেন, তেমিন প্রতিনিয়ত লেখা হবে তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন ছড়া-কবিতা, গল্প, উপন্যাস।

দেলওয়ার বিন রশিদ: ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক

বেনাপোল ইমিগ্রেশনে ই-গেট উদ্বোধন

ইলেকট্রনিক সিস্টেমে আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট বেনাপোল ইমিগ্রেশন ই-গেট উদ্বোধন করা হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতির ঝামেলা না থাকায় মাত্র ৩০/৪০ সেকেন্ডে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন যাত্রীরা নিজেরাই। ফলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ভোগান্তি না থাকায় ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে সহজে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন যাত্রীরা। জার্মানির সাথে জিটুজি চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে শুরু হয় ই-পাসপোর্ট সুবিধা। একই প্রকল্পের অংশ হিসেবে এবার ৪টি ই-গেট বসানো হয়েছে বেনাপোল ইমিগ্রেশনে।

৪ঠা মার্চ বেনাপোল ইমিগ্রেশনে ই-গেট উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। উদ্বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রী ই-পাসপোর্ট ও ই-গেটের মাধ্যমে ডিজিটালাইজড ইমিগ্রেশন কার্যক্রম পরিচালনা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যাত্রীসেবা মানোন্নয়ন তথ্য দ্রুত ও নিরাপদ ইমিগ্রেশনের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সব সদস্য প্রধানমন্ত্রীর এ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সদা সচেষ্ট থাকবে।

এতে যাত্রী ভোগান্তির পাশাপাশি কমবে সময়ের। স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা ইমিগ্রেশন পুলিশের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া নিজেই ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: নওশান আহমেদ

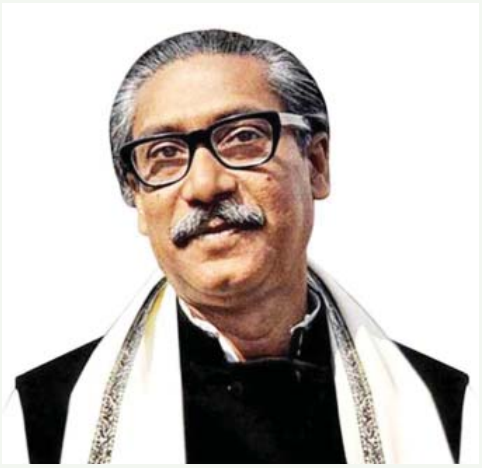

বঙ্গবন্ধু ও নারীসমাজ

তানজিনা চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লাখ শহিদ আর দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা, সকল অত্যাচার-নির্যাতন ও শোষণ-পীড়ন থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করা। বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন নারীদের উপেক্ষা করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করেছিলেন, নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করেছিলেন। নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়েই ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মহিলা আওয়ামী লীগ। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর নারী উন্নয়ন ভাবনা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ম্যানিফেস্টো এবং প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তব্য-বিবৃতিতে তুলে ধরেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোষিত ম্যানিফেস্টোতে। এতে উল্লেখ করা হয়, 'নারী ও পুরুষের মানবিক ও দৈহিক পার্থক্য সাপেক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা ও শক্তি অনুসারে জীবনে চরম উন্নতি লাভের জন্য প্রত্যেক নারীকে পূর্ণতম সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। মাতৃমঙ্গল চিকিৎসালয় এবং সেবা-সদন ও শিশু শিক্ষালয়ে মা ও শিশুর খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক চাকরিজীবী নারীকে সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে পূর্ণ বেতনে বিদায় মঞ্জুর করিতে হইবে।' ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে নয় জন নারীনেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বক্তৃতায় পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ২০টি 'মহিলা আসন' সংরক্ষণ করার জন্য দাবি উত্থাপন করেন। তাছাড়া ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন।

পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর দালাল-রাজাকারদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধে প্রায় দুই লাখ নারী নির্যাতিত হয়েছিলেন। সেসময় অনেক নারী গর্ভবতী হন। বঙ্গবন্ধু এসব নারী ও যুদ্ধশিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নগর বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রদত্ত ভাষণে তাঁর ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। তিনি উক্ত জনসভায় মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন, 'তোমরা বীরাঙ্গনা, তোমরা আমাদের মা'। বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব নিজ উদ্যোগে ১০ জন বীরাঙ্গনার বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় কোনো কোনো বীরাঙ্গনা তাদের বাবার নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে চাইতেন না। বঙ্গবন্ধু তখন বলেছিলেন, 'লিখে দাও পিতার নাম শেখ মুজিবুর রহমান'।

১৯৭২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বোর্ডের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দুটি: (১) নির্যাতিতা নারীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ডাক্তারি সহায়তা প্রদান ছাড়াও নির্যাতিতা, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও গণহত্যার শিকার সকলের মা-বোন ও বিধবাদের সহায়তা করাও বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল। (২) পুনর্বাসন বোর্ডের আওতায় দুস্থ নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সেলাইসহ নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকার বেইলি রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উইমেনস ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'। নারী কল্যাণমূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭২ সালে গঠিত 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড'কে ১৯৭৪ সালে 'নারী পুনর্বাসন

কল্যাণ ফাউন্ডেশন' নামকরণ করা হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠিত হলে সরকারি চাকরিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ অবারিত করে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে একজন নারীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাছাড়া জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। পৌরসভাগুলোতে তিনি দুটি মহিলা কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন। ১৯৭২ সালে নির্যাতিতা নারী, মা ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য সারা দেশে ২২টি সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পিজি হাসপাতালে আলাদা মহিলা ওয়ার্ড চালু করা হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকার নারী কল্যাণে যে সকল আইন প্রণয়ন করে তা হলো:

- গর্ভপাত আইন ১৯৭২
- The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Act 1972
- The Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation Act 1974 (Act - XVI of 1974),
- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪)
- The Bangladesh Girl Guides Association Act 1973 (Act No. XXXI of 1973)

পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অল পাকিস্তান উইমেন অ্যাসোসিয়েশন' ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের নারী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এভাবে বৈশ্বিক নারী উন্নয়ন আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশের নারীসমাজ যুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে মহিলা উন্নয়নের অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' প্রতিষ্ঠার সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেন, যা গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে। বঙ্গবন্ধু 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গঠিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে শিশু পালন, খাদ্য ও পুষ্টি, রোগী সেবা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করার ফলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। নারী উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে নারীদের জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধু নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ চাকরি কোটা রাখার নির্দেশ দেন। মুক্তিযুদ্ধে যে সকল নারী তাদের স্বামী বা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়েছেন তাদের এই পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সেসময় কর্মজীবী নারীদের বাসস্থান ও পরিবহণ সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীসমাজের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়–এ গভীর উপলব্ধি থেকেই দেশকে উপহার দেন ১৯৭২-এর অত্যাধুনিক ও অনন্য সংবিধান, যাতে কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বলা হয়নি, অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এতে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন। এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীসমাজের উন্নয়নে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

তানজিনা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

নাগরিক ভূমি সেবায় জেলাভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগ

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, জেলাভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগ করে নাগরিকগণকে ভূমিসেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য প্রাইভেট এজেন্টশিপ নীতিমালাও প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২রা মার্চ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' এবং 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নাগরিক অধিকার' শীর্ষক এক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী একথা বলেন। ভূমি সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ মুখ্যবক্তা হিসেবে এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশের বাস্তবতায় ডিজিটাল সাক্ষরতা এখনও শতভাগ নয়। এজন্য সবার পক্ষে অনলাইনে ডিজিটাল সার্ভিস গ্রহণ সম্ভব নয়। এজন্য সবদিক বিবেচনা করে, সবার কথা মাথায় রেখে আমরা ভূমি সেবায় এজেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ভূমিমন্ত্রী আরও জানান, ভূমি ভবনে একটি নাগরিক সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে এ সেবা সম্প্রসারণ করা হবে। কলসেন্টার ছাড়াও এসব সেবা কেন্দ্রে নাগরিকরা সরাসরি গিয়ে ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া, প্রাইভেট এজেন্ট কার্যক্রম মনিটরের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে এবং উপজেলা ও জেলাভিত্তিক নাগরিক কমিটি করার কথাও বিবেচনায় রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কোন উপজেলায়, কোন সার্কেলে কতদিনে ফাইল নিষ্পত্তি হচ্ছে– আমরা তা দেখছি এবং ফিডব্যাক নিচ্ছি। পর্যায়ক্রমে মনিটরিং কার্যক্রম অধিক নিবিড় করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় অন্যতম 'পারফর্মিং মিনিস্ট্রি'। 'স্মার্ট মিনিস্ট্রির' কথা মাথায় রেখে আমরা কাজ করছি। মানুষ ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশনের সুফল পাওয়া শুরু করেছে।

প্রতিবেদন: কামরুল ইসলাম

অপারেশন সার্চলাইট নারকীয় গণহত্যা

সুষমা ফাল্গুনী

বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এক ভয়াল বিভীষিকাময় রাত নেমে এসেছিল। মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পূর্ব পরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা অনুযায়ী বাঙালি জাতির কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসে নৃশংস গণহত্যা। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চিরতরে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫শে মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়। এ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বর্তমান সরকার তৎপর।

১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি বৈঠকে ২৫শে মার্চকে সামনে রেখে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবনার ভিত্তিতে মার্চের শুরুতে ১৪তম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি অপারেশনের মূল পরিকল্পনা তৈরি করেন। এদের পেছনে ছিলেন জেনারেল গুল হাসান। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ষোড়শ পদাতিক ডিভিশন এবং খরিয়ান থেকে ১৯তম ডিভিশনকে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের মধ্যে যারা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সামরিক আক্রমণে সমর্থন করেননি, তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের উপর সামরিক হামলার বিরোধী ছিলেন বলে অপারেশনের পূর্বেই তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেখানে বেলুচিস্তানের কসাই নামে নিন্দিত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও জিওসি (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং) করে পাঠানো হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) উত্তাল জনসমুদ্রে দিলেন এক ঐতিহাসিক ভাষণ। সংগ্রামের পূর্বাপর ইতিহাস তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন। অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৫ই মার্চ তিনি ৩৫ দফা নির্দেশনা দেন। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং পরে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো যোগ দেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর কয়েক দফা ব্যর্থ বৈঠক হয়। তলে তলে সুকৌশলে বৈঠকের নামে সামরিক জান্তা ঢাকায় সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা শুরু করে। সময়ক্ষেপণ করে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়। এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

২৫শে মার্চ দুপুরের পর থেকেই ঢাকাসহ সারা দেশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এদিন সকাল থেকেই সেনা কর্মকর্তাদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুরের পর বঙ্গবন্ধু কর্মীদের যার যার এলাকায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ২৪ তারিখই পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্যরা ঢাকা ত্যাগ করে। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সব পদক্ষেপ চূড়ান্ত করে গোপনে ঢাকা ছেড়ে করাচি চলে যান।

অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা পিপিপিকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ তাদের ভয় ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় এলে বহুজাতিক পাকিস্তানি ফেডারেশন ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহী বাঙালিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মার্চের শুরুতে চট্টগ্রামে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় ৩০০ জনেরও বেশি বিহারি নিহত হয়। এই ঘটনার রেশ ধরে পাকিস্তান সরকার অপারেশন সার্চলাইটকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এই সামরিক হস্তক্ষেপের নেপথ্যে প্রতীকী হিসেবে 'বিহারি গণহত্যা' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান ১৭ই মার্চ মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে টেলিফোনের মাধ্যমে অপারেশন পরিকল্পনা করার ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর ১৮ই মার্চ সকালে ঢাকা সেনানিবাসের জিওসি অফিসে অপারেশন সার্চলাইটের একটি খসড়া তৈরি করা হয়। খসড়াটি তৈরি করেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং ১৪তম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা।

২০১২ সালে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক সামরিক অভিযানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা *আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি ইস্ট পাকিস্তান* ১৯৬৯-১৯৭১ শিরোনামের একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত সে আত্মজীবনীতে প্রথমবারের মতো অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেন, ১৯৭১ সালের ১৭ই মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল

টিক্কা খান টেলিফোনে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে কমান্ড হাউসে ডেকে পাঠান। ... তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ১৮ই মার্চ সকাল থেকে ক্যান্টনমেন্টে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার বাসায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং তিনি, দুই জন মিলে অপারেশন সার্চলাইটের খসড়া তৈরি করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা দুইজন পরিকল্পনার পরিসর নিয়ে একমত হন। সন্ধ্যায় খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে তারা হাজির হন কমান্ড হাউসে। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং কোনো আলোচনা ছাড়াই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিদ্দিক সালিক। *উইটনেস টু সারেন্ডার* শিরোনামের একটি বইয়ে তিনি 'অপারেশন সার্চলাইট' নিয়ে লিখেছেন, জেনারেল রাও ফরমান আলী হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডের ওপর একটি সাধারণ কাঠ পেন্সিল দিয়ে ঐ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, তিনি স্বচক্ষে সেই হাতে লেখা পরিকল্পনার খসড়া দেখেছিলেন। তাতে সামরিক অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, 'শেখ মুজিবের ডিফ্যাক্টো শাসনকে উৎখাত করা এবং সরকারের (পাকিস্তানের) কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।' সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিকল্পনা ছিল ১৬টি প্যারা সংবলিত এবং পাঁচ পৃষ্ঠা দীর্ঘ।

হাতে লেখা পরিকল্পনাটি জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ২০শে মার্চ ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে পর্যালোচনা করেছিলেন। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪-২৫শে মার্চ জেনারেল হামিদ, জেনারেল এ. ও. মিঠ্ঠি, কর্নেল সাদউল্লাহ হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন।

সিদ্ধান্ত হয়, ২৫শে মার্চ রাত ১টায় অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় অভিযানে ঢাকায় নেতৃত্ব দেবেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেতৃত্ব দেবেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৩১তম ফিল্ড কমান্ডে উপস্থিত থেকে অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া এই অভিযানকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দুজন ঘনিষ্ঠ অফিসার মেজর জেনারেল ইখতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ. ও. মিঠ্ঠিকে ঢাকায় আনা হয়। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ঠিক ১টায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪০ জনের ৩টি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ (জিয়াউল্লাহ) খান। সেই সাথে অন্যান্য গ্যারিসনকে তাদের কার্যক্রম শুরু করার জন্য ফোনের মাধ্যমে জানানো হয়।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজীর জনসংযোগ অফিসারের দায়িত্বে থাকা সিদ্দিক সালিক-এর *উইটনেস টু সারেন্ডার* গ্রন্থেও এ সংক্রান্ত একটি বিবরণ পাওয়া যায়। অপারেশন সার্চলাইট শুরুর মুহূর্ত নিয়ে তিনি লিখেন 'নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সামরিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এমন আঘাত হানার নির্ধারিত মুহূর্ত (এইচ-আওয়ার) পর্যন্ত স্থির থাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল।' তিনি মন্তব্য করেন যে বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে ২৫শে মার্চ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু করে। পাকিস্তান সৈন্যরা ১১টা ৩০ মিনিটে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মগেটে মিছিলরত বিক্ষোভকারী বাঙালিদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা ঘটায়। এটি ছিল অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম হামলা।

মধ্যরাতে পিলখানা, রাজারবাগ, নীলক্ষেত আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনারা। হানাদার বাহিনী ট্যাংক ও মর্টারের মাধ্যমে নীলক্ষেতসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল নেয়। সেনাবাহিনীর মেশিন গানের গুলিতে, ট্যাংক-মর্টারের গোলায় ও আগুনের লেলিহান শিখায় নগরীর রাত হয়ে উঠে বিভীষিকাময়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকা গণমাধ্যমও সেদিন রেহাই পায়নি জল্লাদ ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা থেকে। পাকিস্তানি হানাদারেরা সেই রাতে অগ্নিসংযোগ করে, মর্টার শেল ছুড়ে একে একে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, জাতীয় প্রেসক্লাব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ হামলায় জীবন দিতে হয় কয়েক জন গণমাধ্যমকর্মীকেও। এমনকি রাজপথের সাধারণ নাগরিকও বাদ যায়নি এই চরম জিঘাংসা থেকে। রিকশার হুড তুলে সিটে শুয়ে থাকা চালকদের ঘুমের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করা হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। বহু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এক রাতের মধ্যেই তারা পূর্ব পাকিস্তানকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলে। একদিনে এত মানুষ একসঙ্গে হত্যা বিশ্বে নজিরবিহীন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থেকে ২৫শে মার্চ অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। পরদিন ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ভুট্টো সেনাবাহিনীর আগের রাতের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।'

ইয়াহিয়া খানসহ সামরিক কর্মকর্তাদের সবাই অভিযানের প্রশংসা করেন। এমনকি পরবর্তী ৫ই আগস্ট পাকিস্তান সরকার যে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে তাতে ২৫শে মার্চ সামরিক অভিযানকে 'অত্যাবশ্যকীয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই গণহত্যার তথ্য পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত দলিলেও রয়েছে। একই শ্বেতপত্রে বলা হয়– '১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত পর্যন্ত ১ লাখেরও বেশি মানুষের জীবননাশ হয়েছিল।'

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইট অভিযানের মাধ্যমে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর হিংস্র দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ অভিযানের শুরুতেই হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের আগে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যে-কোনো মূল্যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র লড়াই শেষে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করে।

সুষমা ফাল্গুনী : কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

যদি থাকে নৈতিকতা
আসবে সবার সফলতা

জাতীয় পতাকা আমাদের অহংকার

প্রশান্ত দে

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল উপাখ্যানের অন্যতম ধারক ও বাহক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। এ জাতীয় পতাকা শুধু একটি কাপড় নয়; এ পতাকার লাল-সবুজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে বাঙালিদের অপরিমেয় আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনি। তাই এ পতাকা বাঙালির আবেগ। বাঙালির অহংকার। বাঙালির গর্ব।

২রা মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে প্রথম সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্তের মাঝখানে মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। আমাদের জাতীয় পতাকা অর্জন একদিনে হয়নি। এর পেছনে লুকিয়ে আছে আমাদের রক্তিম দীর্ঘ ইতিহাস। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, গৌরব, জাতীয়তা আর মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের আজকের এ লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা। শুরুটা হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এরপর দীর্ঘ বিশ বছরের অপেক্ষা। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুক্তির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্তে অর্জিত হয় আমাদের জাতীয় পতাকা। আর এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় একাগ্রচিত্তে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালেই জাতীয় পতাকার নকশার কাজ করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের ৬ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এক কক্ষে পতাকার প্রাথমিক নকশা করা হয়। আর এ নকশায় অংশগ্রহণ করেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবুজ জমিনে লাল সূর্যের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকার নকশাটি চূড়ান্ত হয়। পতাকায় বাংলাদেশের এই মানচিত্রটি একটি বিশেষ কারণবশত যোগ করা হয়। কারণ সে সময় মানুষের মুখে মুখে ছিল পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা। আবার স্লোগানও ছিল 'জয় বাংলা'। যেহেতু আমরা পূর্ব বাংলার বাঙালিরা ছিলাম স্বাধীনতাকামী, তাই তখন সিদ্ধান্ত হয় পতাকায় দেওয়া থাকবে তৎকালীন পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর ভূমি প্রতিকৃতি তথা মানচিত্র। এরপর কজন ছাত্রনেতা ঢাকা নিউ মার্কেটের এক বিহারি দর্জির দোকান থেকে বড়ো এক টুকরো সবুজ কাপড়ের মাঝে লাল একটি বৃত্ত সেলাই করে আনেন। তারপর ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আজম হল (বর্তমানে তিতুমীর হল)-এর এক কক্ষে ট্রেসিং পেপারে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা হয়। পরিশেষে ছাত্রনেতা শিবনারায়ণ দাশ তাঁর নিপুণ হাতে মানচিত্রটি লাল বৃত্তের মাঝে আঁকেন। আর এভাবেই আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা পাই।

১৯৭১ সালের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বটতলায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ৩রা মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অগ্নিঝরা ভাষণ দেন। স্বাধীনতার ডাক দেন। ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শিবনারায়ণ দাশের ডিজাইনকৃত পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রং ও তার ব্যাখ্যা সংবলিত একটি প্রতিবেদন দিতে বলেন শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানকে। কামরুল হাসান দ্বারা পরিমার্জিত রূপটিই বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। কামরুল হাসানের নকশা করা বাংলাদেশের পতাকাটি ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি দাপ্তরিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরে বর্তমান মুজিবনগরের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণকালীন জাতীয় সংগীত গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৮ই এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনের প্রধান এম হোসেন আলী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এটিই বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

১৯৭২ সালে পতাকার জন্য প্রণীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা। এই বিধিমালা অনুযায়ী বর্তমান জাতীয় পতাকার মাপ এবং প্রকৃতি নিম্নরূপ:

১) পতাকাটি হবে গাঢ় সবুজ রঙের এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬, এমন একটি সবুজ রঙের আয়তক্ষেত্রের মধ্যভাগের কাছাকাছি থাকবে একটি লাল বৃত্ত।

২) লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত লম্বরেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার ছেদবিন্দুই হবে লাল বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ পতাকার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট, লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ২ ফুট, পতাকার দৈর্ঘ্যের সাড়ে ৪ ফুট ওপরে প্রস্থের মাঝ বরাবর অঙ্কিত আনুপাতিক রেখার ছেদবিন্দু হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু।

৩) পতাকার সবুজ পটভূমিতে থাকবে প্রতি হাজারে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট গ্রিন এইচ-২ আর এস ৫০ পার্টস

রং এবং লাল বৃত্তটি হবে প্রতি হাজারে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট অরেঞ্জ এইচ-২ আর এস ৬০ পার্টস রঙের।

এছাড়া পতাকা ব্যবহারের জন্য সরকারি নির্দেশনানুযায়ী বিভিন্ন মাপ রয়েছে। যেমন: ভবনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১০ বাই ৬ ফুট (৩.০ বাই ১.৮ মিটার) কিংবা ৫ বাই ৩ ফুট (১.৫২ বাই ০.৯১ মিটার) কিংবা ২.৫ বাই ১.৫ ফুট (৭৬০ বাই ৪৬০ মিলিমিটার)। মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপের মধ্যে বড়ো গাড়ির জন্য ১৫ বাই ৯ ইঞ্চি (৩৮০ বাই ২৩০ মিলিমিটার) এবং ছোটো ও মাঝারি গাড়ির জন্য ১০ বাই ৬ ইঞ্চি (২৫০ বাই ১৫০ মিলিমিটার)। আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠানে যেসব টেবিল পতাকা ব্যবহৃত হয় সেগুলোর জন্য ১০ বাই ৬ ইঞ্চি (২৫০ বাই ১৫০ মিলিমিটার) মাপটি নির্ধারিত।

জাতীয় পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)-এ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের বিভিন্ন বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের নিদর্শন। তাই সব সরকারি ভবন, অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভবনে সব কর্মদিবসে পতাকা উত্তোলনের বিধান রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেমন: ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস ও সরকার প্রজ্ঞাপিত অন্য যে-কোনো দিবসে বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি ভবন ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন প্রাঙ্গণে এবং কনস্যুলার কেন্দ্রগুলোয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বা শহিদ দিবস ও ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বা সরকার প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকার বিধান করা হয়েছে। অর্ধনমিত রাখতে হলে পতাকা উত্তোলনের নিয়ম হলো, অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের প্রাক্কালে পতাকাটি পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত অবস্থানে আনতে হবে এবং পতাকা নামানোর প্রাক্কালে পতাকাটি শীর্ষে উত্তোলন করে নামাতে হবে।

গাড়িতে পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কেউ ইচ্ছা করলেই পতাকা ব্যবহার করতে পারবে না। কোন কোন ভবনে ও কারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন, এ সম্পর্কে ঐ আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে। ঐ ধারায় বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও অফিসে সব কর্মদিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ৬ (৩) ধারায় বলা হয়েছে– রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে, নৌযানে ও বিমানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবে। এছাড়া স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা, মন্ত্রী সমমর্যাদার ব্যক্তি, বিদেশে বাংলাদেশি মিশনের প্রধানের গাড়িতে ও তাদের নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। প্রতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উপমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজধানীর বাইরে ভ্রমণকালে গাড়িতে ও নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। বিধিমালার ৭ ধারায় জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যদি পাশাপাশি ২টি পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা ভবনের ডান দিকে উত্তোলন করতে হবে। জাতীয় পতাকার ওপর অন্য কোনো পতাকা উত্তোলন করা যাবে না।

গিনেস বিশ্ব রেকর্ডেও আমাদের জাতীয় পতাকা তার স্থান করে নিয়েছে। ২০১৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে ঢাকার শেরে বাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৭,১১৭ জন মানুষের উপস্থিতিতে 'মানব পতাকা' গঠন করা হয়, যা গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মানব পতাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রতিটি বাঙালির গর্ব ও অহংকার। সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা অর্জন করেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ পতাকা আমাদের সব মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ পতাকাতলে দাঁড়িয়ে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। বীর শহিদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা ও স্বাধীন পতাকা আমাদের প্রত্যেক বাঙালির কাছে সমান শ্রদ্ধার ও সম্মানের। লাল-সবুজের এ পতাকা আমাদের প্রত্যেকের জাতীয়তাবোধকে সমুন্নত রাখে। দেশের প্রতি অবিচল থাকার শিক্ষা দেয়, দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা দেয়। তাই কবির ভাষায় বলতে চাই– হয় যদি হয় জীবন দিতে/ হব আগুয়ান/ প্রাণ দিয়ে বাঁচাবো মোরা/ লাল-সবুজের মান।

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালন

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ২১শে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় মহান 'ভাষা শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩'। একুশের শুরুতে উপ-হাইকমিশন চত্বরে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় সংগীতের সাথে পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা অর্ধনমিত করেন উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। এরপর ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ১ মিনিট নীরবতা পালন, মিশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আয়োজিত প্রভাতফেরি শুরু হয়। প্রভাতফেরিটি 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র' থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন চত্বরে এসে শেষ হয়। এ প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন কলকাতার কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীগণ এবং বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রভাতফেরি শেষে উপ-হাইকমিশন চত্বরে অবস্থিত শহিদমিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এসময় উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস তার বক্তব্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৫২-এর প্রেরণায় আমরা পেয়েছিলাম ১৯৭১-এর স্বাধীনতা। জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য উপ-হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন: অনিন্দ্য সরকার

ভোক্তা অধিকার দিবস

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সুরাইয়া ইসলাম

অর্থনীতির ভাষায়, উৎপাদিত পণ্য ও সেবা চূড়ান্ত ভোগের জন্য যিনি ক্রয় করেন, তিনিই ভোক্তা। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকই ভোক্তা। একজন ভোক্তা হিসেবে তার রয়েছে 'ভোক্তা অধিকার'। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ১৯৬২ সালের ১৫ই মার্চ কংগ্রেসে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি ভোক্তার চারটি অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এগুলো হলো– নিরাপত্তার অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, পছন্দের অধিকার এবং অভিযোগ প্রদানের অধিকার। জাতিসংঘ ১৯৮৫ সালে কেনেডি বর্ণিত চারটি মৌলিক অধিকারকে আরও বিস্তৃত করে এর সাথে অতিরিক্ত আরও আটটি মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করে। কেনেডির ভাষণের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে দিনটিকে 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'নিরাপদ জ্বালানি, ভোক্তাবান্ধব পৃথিবী'।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন করে। এ আইনটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সরকারি সংস্থা। সংস্থাটি পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। ঢাকায় প্রধান সদর দপ্তরসহ বিভাগ ও জেলা পর্যায়েও রয়েছে সংস্থাটির দপ্তর। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ডিবিআইডি) কার্যক্রম শুরু করেছে সংস্থাটি। এর মাধ্যমে সারা দেশে সব ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান এবং এফ-কমার্স সাইটগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতার কাছে নিম্নমানের পণ্য বিক্রি, দাম অনুযায়ী পণ্যের মান বা সেবা সঠিক না হলে, ওজনে বা পরিমাপে কম দেওয়া বা এ সংক্রান্ত যে-কোনো জালিয়াতি, নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ। একইসঙ্গে এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ভোক্তা অধিকার আইনে একজন ব্যক্তি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন– যোগাযোগ, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন এসব নিয়েও অভিযোগ করতে পারবেন। আবার খাবার দোকান, আবাসিক হোটেল বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা নিয়েও অভিযোগ ও মামলা করার সুযোগ রয়েছে এই আইনে। ভোক্তাবিরোধী কাজের জন্য ১ বছর থেকে ৩ বছর কারাদণ্ডের এবং ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে এই আইনে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মোট ৮২টি ধারা ও কয়েকটি উপধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারার মধ্যে রয়েছে– কোনো পণ্যের মোড়ক না থাকলে কিংবা পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না থাকলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ধারায় বিক্রেতাকে অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে আদালত। যদি কোনো বিক্রেতা নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে তাহলে বিক্রেতাকে অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে উক্ত আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী। এ আইনের ৪১ ধারা অনুযায়ী, কোনো বিক্রেতা যদি ভেজাল পণ্য বিক্রয়ের সাথে জড়িত থাকে তাহলে বিক্রেতাকে ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। যদি কোনো বিক্রেতা পণ্যের উৎপাদনের সময় নিষিদ্ধ উপকরণ মিশ্রণ করে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে আদালত। এই আইনের ৪৪ ধারা মোতাবেক, ইচ্ছাকৃত অধিক মুনাফার লোভে বিক্রেতা মিথ্যা তথ্য বা বিজ্ঞাপন দ্বারা আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করলে অনধিক ১ বছর কারাদণ্ড বা ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

ভোক্তা অধিকারের সঙ্গে মানুষের জীবন-জীবিকা ও বেঁচে থাকার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একজন ব্যক্তি যখন কোনো পণ্য ক্রয় করেন, তখন তার জানার অধিকার রয়েছে পণ্যটি কবে উৎপাদিত হয়েছে, কোথায় উৎপাদিত হয়েছে এবং এর কাঁচামাল কী কী, মূল্য কত ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে একজন বিক্রেতা বাধ্য। যদি কোনো বিক্রেতা এসব প্রশ্নের উত্তর না দেন বা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন, তখন আইন অনুযায়ী তাতে ভোক্তা অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৭৬(১) ধারা অনুযায়ী, 'যে কোনো ব্যক্তি, যিনি সাধারণভাবে একজন ভোক্তা বা ভোক্তা হইতে পারেন, এই অধ্যাদেশের অধীন ভোক্তা অধিকারবিরোধী কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিয়া লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন'। ভোক্তাদের সকল ভোগান্তি দূর করতে এবং অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সর্বদা সজাগ থাকে। কোনো ভোক্তা পণ্য ক্রয় করে প্রতারিত হলে সহজে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে সরাসরি ই-মেইলের (info@dncrp.gov.bd) মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারেন। ই-মেইলে অভিযোগকারীর নাম, পিতামাতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার বিবরণ এবং প্রমাণস্বরূপ পণ্য ক্রয়ের রশিদের ছবি সংযুক্ত করতে হবে। তাছাড়া ০১৭৭৭৭৫৩৬৬৮ এবং ০৩১-৭৪১২১২ নম্বরে ফোন করেও অভিযোগ দায়ের করা যায়। অভিযোগটি অবশ্যই পণ্য ক্রয়ের ৩০ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে। তদন্তে প্রমাণিত হলে অভিযোগকারী জরিমানার ২৫% পাবেন। এছাড়া ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘিত হলে অধিদপ্তরের হটলাইন নম্বর ১৬১২১-এ অভিযোগ করা যায়।

সারা বিশ্বের ভোক্তা সংগঠনগুলোর ফেডারেশন কনজ্যুমার ইন্টারন্যাশনাল (সিআই) ভোক্তা অধিকার প্রচারণার একমাত্র সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। বিশ্বের ২৫০টি দেশ সংগঠনটির সদস্য। বাংলাদেশের একমাত্র ও শীর্ষস্থানীয় ভোক্তা সংগঠন কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সিআই-এর সদস্য। করোনার বিধিনিষেধের সময় এবং বর্তমানেও অনলাইন কেনাকাটা বেশ জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাড়ছে ই-কমার্স সেবা ও অনলাইন কেন্দ্রিক লেনদেনের প্রবণতা। চলছে ই-কমার্স, অনলাইন ফুড ডেলিভারি সিস্টেম, ই-টিকেটিং, বিভিন্ন সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, অ্যাপের বিক্রয়, মোবাইল ব্যাংকিংসহ অনলাইনে বিভিন্ন সেবা। এসব ক্ষেত্রে ঘটে থাকে নানা ধরনের প্রতারণাও। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এসকল ক্ষেত্রেও কাজ করছে দক্ষতার সাথে।

অন্যসব আইনের থেকে 'ভোক্তা অধিকার আইন' একটি বিশেষ আইন। তাই এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। সবাই যখন সচেতন হবে, তখনই আইনটির যথাযথ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বন্ধ হবে বাজারের নৈরাজ্য এবং সংরক্ষিত হবে ভোক্তার অধিকার। আমাদের একটুখানি সচেতনতাই পারে নিরাপদ খাদ্য ও ভেজালমুক্ত পণ্যের বাংলাদেশ গড়তে।

সুরাইয়া ইসলাম : প্রাবন্ধিক

মুরগিছানা চিকেনচি

জসীম আল ফাহিম

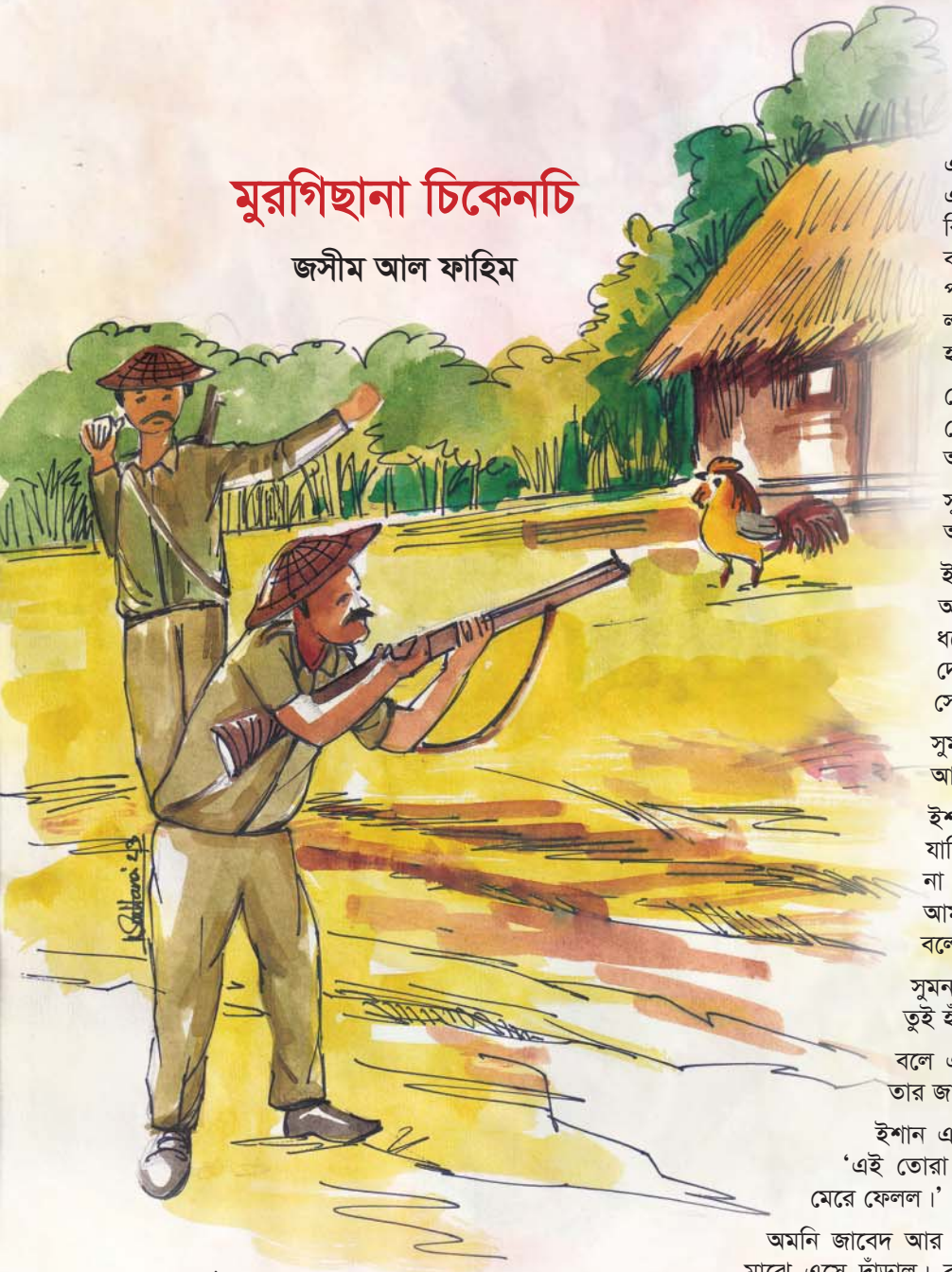

চিলের ঠোঁটে একটা মুরগিছানা। ছানাটি সে কোথা থেকে ধরে আনল কে জানে। তবে ওর ঠোঁটের মধ্যে থেকেই ছানাটি ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল–চিঁউ চিঁউ চিঁউ!

মুরগিছানার এরূপ কলজে কাঁপানো চিৎকার শুনে উপরের দিকে একবার তাকালো ইশান। অমনি সে চিলের ঠোঁটে মুরগিছানাটি দেখতে পেল। আরও কয়েকজন ছেলের সঙ্গে মাঠে খেলা করছিল সে। ডাংগুলি খেলা। ইশানের দেখাদেখি ঐ ছেলেগুলোও অবাক হয়ে উড়ন্ত চিলটাকে দেখছিল। কিন্তু কারও কিছু করার ছিল না। সকলেই হায়-আফসোস করছিল।

ইশানের হঠাৎ কী যেন মনে হলো, সে চিলটাকে উদ্দেশ্য করে হাতের ডাংটা ছুড়ে মারল। ওর হাতের নিশানা চমৎকার। ডাংটা চিলের গায়ে প্রায় লেগে গিয়েও লাগেনি। কারণ সে সময় চিলটা মুরগিছানাকে ছেড়ে দিয়ে গুঁইতি মেরে ডাংয়ের পাশ কেটে সরে যায়। আশাতীত ডাংয়ের আঘাত থেকে রক্ষা পেল চিলটা। তারপর আকাশের বুকে আরও দুটো চক্কর দিয়ে সে দূরে উড়ে গেল। কোথায় গেল কে জানে। তবে সে আর ফিরে এল না।

এদিকে মুরগিছানাটা নীচে পড়তে পড়তে একেবারে ছেলেদের মাঝে এসে পড়ল। কিছু ঘাস আর লতাপাতার ওপর পড়ায় বলা যায় একপ্রকার প্রাণে রক্ষা। নীচে পড়ে ছানাটা টালমাটালভাবে চলতে লাগল। অমনি সুমন ছুটে এসে ওটাকে হাতে তুলে নিল।

দেখে ইশান মারমুখী হয়ে ওর কাছে ছুটে গেল। বলল, 'এটা আমার মুরগিছানা। আমাকে দে।'

সুমন তখন বেঁকে বসল। বলল, 'আমি আগে ধরেছি। তাই এটা এখন আমার।'

ইশান বলল, 'উড়ন্ত চিলটাকে ডাং মেরে আমি এটাকে নামিয়ে এনেছি। আর তুই ধরেছিস বলেই কি এখন তোর হয়ে যাবে? দে বলছি। ছানাটা আহত। ওকে আমি সেবা করব।'

সুমন গোঁ ধরে বলল, 'সেবা করতে হলে আমিই করতে পারব।'

ইশান বলল, 'সুমন তুই কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। কাজটা তুই মোটেও ঠিক করছিস না। ভারি অন্যায় হচ্ছে তোর। জলদি ছানাটি আমার হাতে তুলে দে। নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

সুমন চিৎকার দিয়ে বলল, 'না দিলে কী করবি তুই হ্যাঁ? মারবি? মার দেখি...।'

বলে এক হাতে ছানাটি ধরে সুমন অন্য হাতে তার জামার হাতা গোটাতে লাগল।

ইশান এবার অন্য ছেলেদের উদ্দেশ করে বলল, 'এই তোরা করছিস কী! দেখছিস না ছানাটাকে ও মেরে ফেলল।'

অমনি জাবেদ আর অজিত মধ্যস্থতা করতে ওদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এই সুমন এটা আসলে ইশানের ছানা। কথা বাড়াস না। ইশানের জিনিস ইশানকেই দিয়ে দে।'

সুমন আরও কঠিন গলায় বলল, 'দেবো না।'

ইশান এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 'তবে রে বেটা হারামজাদা। আয় দেখাচ্ছি মজা–'

বলে সে সুমনের জামার কলার ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর ওর বুকের ওপর চড়ে বসে বলল, 'ছানাটা দিবি কি না বল। নইলে তোকে শোয়া থেকে আর কোনোদিন উঠতে দেবো না–' বলে ইশান সুমনের মুখে দুটো ঘুসি মারল। জাবেদ ও অজিত তখন গিয়ে ইশানের কবল থেকে সুমনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। সুমনের মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে সুমন ছানাটা দূরে ছুড়ে মারল। ছানাটা শূন্যে উড়ে গিয়ে ঘাসের ঝোপের ভেতর পড়ল। তখন ইশান ওকে ছেড়ে দিয়ে ছানার উদ্দেশে ছুটে গেল।

সুমন শোয়া থেকে উঠে বসল। চোখ-মুখ ফুলে গেছে তার।

মুখে চিনচিন ব্যথা হচ্ছে। সে ব্যথার স্থানটাতে হাত দিয়ে দেখল–একদলা রক্ত! রক্ত দেখে সে হাউমাউ কান্নাজুড়ে দিলো। সেটা কী ভয়ে, নাকি দুঃখে ঠিক বোঝা গেল না।

এদিকে ঝোপের ভেতর থেকে ইশান মুরগিছানাটিকে ধরে আনলো। ছানাটিকে নিয়ে সে জোরসে দৌড় লাগাল। দৌড়াতে দৌড়াতে সোজা বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি এসে ছানাটির সেবা-শুশ্রূষায় মেতে উঠল। রান্নাঘর থেকে বয়াম খুলে হলুদের গুঁড়ো আনলো। হলুদের গুঁড়োতে ক্ষত সারার উপাদান থাকে। ছানাটার শরীরের ক্ষতস্থানে হলুদের গুঁড়ো মেখে দিলো সে।

সে সময় ইশানের মা উঁকি দিয়ে ছেলের কাণ্ড দেখে তো হতবাক। বলেন, 'এটা কী রে বাবা! এই আপদ আবার কোথা থেকে জুটিয়েছিস?'

ইশান বলে, 'আপদ না মা। ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু! মুরগিছানা কারও বন্ধু হয়! হা হা হা–' বলে মা হাসতে লাগলেন।

ইশান মুরগিছানা পাওয়ার গল্পটা মাকে শোনাল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলেন মা। বললেন, 'আচ্ছা। তোর বন্ধুকে তুই পালন করতে থাক।'

মায়ের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে ইশান বলল, 'মা, তুমি ওর একটা নাম দাও না।'

মা হেসে বলেন, 'মুরগিছানার আবার নাম কী রে বেটা! তুই-ই একটা ঠিক করে নে।'

মায়ের কথা শুনে ইশান ভাবনায় পড়ে গেল। কী নাম দেওয়া যায় মুরগিছানাটার! কী নাম দেওয়া যায়! ভাবতে ভাবতে শেষে সে একটা যুতসই নাম পেয়েও গেল–চিকেনচি। পরে সে মাকে উদ্দেশ করে বলল, 'মা আজ থেকে ওর নাম হলো চিকেনচি।'

মা বলেন, 'ঠিক আছে। যেমন তোর ইচ্ছে।'

মোটামুটি সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মুরগিছানাটি সেরে উঠল। সে নিজে নিজেই ঠুকে ঠুকে দানা জাতীয় খাবার খেতে পারে। ইশান এখন মুরগিছানাকে নিয়েই মহাব্যস্ত। চিকেনচি নামটা শেখানোর জন্য সে বলা যায় উঠেপড়ে লেগেছে। কথায় বলে–লেগে থাকলে হয়ে যায়। ইশানের চেষ্টাও সাফল্যের মুখ দেখল। চিকেনচি নামটা সে ওকে যথাযথ শেখাতে পেরেছে। কারণ চিকেনচি বলে একবার ডাক দিলেই হলো। ছানাটি যেখানেই থাকুক না কেন ওর কাছে ছুটে আসবে। এসে ছানাটি ওর পায়ে পায়ে ঘুরবে। সে যেখানে যায়, ছানাটিও সেখানে যাবে। সে যা বলে ছানাটিও তাই করবে। আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি!

তারপর কেটে গেল প্রায় বছর দুয়েক সময়। এতদিনে ছোট্ট মুরগিছানাটি পুরোপুরি বড়ো হয়ে গেছে। ছোট্ট ছানাটা এখন সুদর্শন রাতা মোরগ! প্রতিদিনই সে শেষ রাতে সকলের আগে জেগে ওঠে। উঠে আপনমনে গলা সাধে। গলা ছেড়ে সে গান করে–

কুক-কুরো-কুক-কুক!

কুক-কুরো-কুক-কুক!

ওর এরূপ গান শুনেই বলা যায় পাড়াপ্রতিবেশীর এখন ঘুম ভাঙে। রাতা মোরগটা দেখতে কী সুন্দরই না হয়েছে! নাদুসনুদুস শরীর। লাল টকটকে গায়ের রং। মাথায় অপূর্ব ঝুটি। সোনালি রঙের জোড়া পা। কালো রঙের লম্বা লেজ। ও যখন হাঁটে রাজকীয় ভঙ্গিমা নিয়েই হাঁটে। ও যখন রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেঁটে যায়, তখন যে কেউ ওর পানে বারেক না-তাকিয়ে পারে না।

মোরগটা লড়াই করতে বেশ ওস্তাদ। আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে লড়ে অন্য কোনো মোরগ জিতে যেতে পারেনি। বরাবরই ওরা লড়াইয়ে হেরে লেজ গুটিয়ে ফিরে গেছে। মোরগ নিয়ে লড়াইয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়দিনই আশপাশের গ্রামগুলো থেকে ইশানের কাছে আমন্ত্রণ আসে। ইশানও এখন চিকেনচিকে এগ্রাম থেকে ওগ্রামে নিয়ে যায়। চিকেনচি লড়াই করে। লড়াইয়ে জিতে তবেই বাড়ি ফিরে।

ইশানের এমন বাউণ্ডেলেপনা লক্ষ করে সেদিন বাবা ওকে সাবধান করে দিলেন। বললেন, 'বাবা ইশান! দেশের অবস্থা ভালো না। সারা দেশে তুমুল মুক্তিযুদ্ধ চলছে। চিকেনচিকে নিয়ে তোর এভাবে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোটা উচিত হচ্ছে না। সবখানে বিপদ ওত পেতে আছে। কখন কী হয় ঠিক বলা যায় না।'

ইশান বলে, 'আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করো না বাবা। আমি সবসময় সাবধানেই চলি।'

বাবা বলেন, 'সাবধানে চলিস বললেই তো আর হবে না। কাল থেকে তুই বাড়ির বাইরে যাবি না। আমি ঠিক করেছি আজ রাতেই বাড়ি থেকে বেরুব। মুক্তিযুদ্ধে যাব আমি। দেশমাতৃকার এখন চরম দুর্দিন চলছে। এমন দুর্দিনে ঘরে বসে থাকাটা ঠিক নয়। আমি যুদ্ধ থেকে না-ফেরা পর্যন্ত তুই চিকেনচিকে নিয়ে কোথাও বেরুবি না। আমার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবিও না। মনে থাকবে?'

বাবার কথার কোনো জবাব দিলো না ইশান। শুধু একবার ঢোক গিলল। মনে মনে ভাবতে লাগল সে–আগামীকাল বিকেলে সুমনদের গাঁয়ে মোরগের লড়াই হওয়ার কথা। সুমনের মোরগের সঙ্গে চিকেনচির লড়াই। চিকেনচিকে নিশ্চয়ই লড়াইয়ে নিয়ে যেতে হবে। না-নিয়ে গেলে ওরা আবার ভাববে সে বোধ হয় ভয় পেয়েছে। কী করা এখন!

বাবা আবার বললেন, 'আমার কথা কি তোর কানে ঢুকেছে?'

ইশান মিনমিন করে বলল, 'জি বাবা।'

বাবা বলেন, 'মনে থাকে যেন।'

মাঝরাতে ইশানের বাবা ঠিকই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। এতরাতে বাবার বেরুবার কারণ আছে। আশপাশের বাড়িঘরে রাজাকাররা গিজগিজ করছে। কয়েক বাড়ির মধ্যে বাবাই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা। রাজাকাররা বিষয়টা আঁচ করতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই মাঝরাতকেই তিনি উপযুক্ত সময় বিবেচনা করলেন।

সকালে ঘুম থেকে জেগে ইশান বাবাকে দেখতে পেল না। না-দেখতে পেলেও সে বুঝে গেল বাবা মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছেন। বিকেলবেলা ইশান ঠিকই বাবার বারণের কথা ভুলে গেল। মায়ের দু-চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে সে চিকেনচিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সোজা সুমনদের গ্রামে চলে গেল।

গিয়ে দেখল সুমনদের গ্রামে মোরগের লড়াইয়ের জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে ছোটোখাটো একটা মাঠ তৈরি করা হয়েছে। লাল, নীল সবুজ, হলুদ রঙের কাগজ দিয়ে নিশান তৈরি করে সুতো টানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শকের দাঁড়ানোর জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ইশান মনে মনে ভাবে, আজ লড়াইয়ে না-এলে কী ঠকাটাই না ঠকতে হতো।

কিছুসময়ের মধ্যেই মোরগের লড়াই দেখার জন্য উচ্ছ্বসিত দর্শক উপচে পড়ল। চিকেনচির সঙ্গে লড়াই করার জন্য সুমনের হৃষ্টপুষ্ট মোরগটা এনে খোলা মাঠে ছেড়ে দেওয়া হলো। দেখতে না-দেখতেই দুটো মোরগের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল। চারপাশ ঘিরে উচ্ছ্বসিত দর্শক হইচইয়ে মেতে উঠল। সুমনের মোরগটা একটা ধেড়ে মোরগ। শক্তিও কম নয় বোঝা যায়। চিকেনচিকে সে বেশ কয়েকবার শক্ত করে ঠোকর দিলো। ঠোকরের স্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

চিকেনচির স্বভাব একটু অন্যরকম। সে প্রথমে শুধু মার খাবে। তারপর মরণ ঠোকর বসাবে। এবারও তাই ঘটল। সুমনের ধেড়ে মোরগটাকে সে মরণ ঠোকরই ঠোকরাতে লাগল। চিকেনচির ঠোকরের পর ঠোকর খেয়ে সুমনের মোরগটা শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলো। লেজ গুটিয়ে মাথা নুইয়ে সে মাঠ থেকে বিদায় নিলো। লড়াইয়ে চিকেনচি বিজয়ী হলো। বিচারকমণ্ডলী ইশানের হাতে বিজয়ী মেডেল তুলে দিলো।

ইশান বিজয়ী মেডেল লাভ করায় সুমনের চোখে জল নেমে এল। রাগে-ক্ষোভে সে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল। কিন্তু করার যে কিছু নেই। সবই অদৃষ্টের লিখন। মনের রাগ বুকে পুষে ধীর পায়ে সে ইশানের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সুমনকে দেখে ইশান হতচকিত হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'কিছু বলবে সুমন?'

সুমন বলল, 'এটা কী মোরগ রে! এত শক্তি ওর গায়ে! পেলি কোথায়?'

সুমনের কথা শুনে ইশান মনে মনে খুব গর্বিত হলো। মিটিমিটি হেসে বলল, 'চিলের ঠোঁট থেকে পাওয়া সেই মুরগিছানাটার কথা তোর মনে আছে সুমন? এটা সেই মুরগিছানা।'

ইশানের কথাটা শুনে সুমনের মুখখানা সহসা রক্তাভ হয়ে উঠল। মুহূর্তে সবই মনে পড়ল তার। ইশানের দেওয়া ঘুসি দুটো যেন এখনো তার মুখে লেগে আছে। রাগে-দুঃখে মুখখানা বিকৃত করে সে আর একমুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকল না। লম্বা পা ফেলে হনহন করে ফিরে গেল। অবাক চোখে ইশান সুমনের চলে যাওয়া দেখছিল।

পরদিন সকালবেলা। মায়ের সঙ্গে নাস্তা করতে বসল ইশান। মা বললেন, 'তুই তোর বাবার বারণ শুনিসনি। কাজটা কি ঠিক করেছিস রে বেটা?'

ইশান অনুনয়-বিনয় করে বলল, 'এমনটি আর কখনো হবে না মা। এই কান ধরছি। মাফ চাইছি।'

মা বলেন, 'মনে থাকে যেন মাফ চাওয়ার কথা।'

সে সময় হঠাৎ বাড়ির উঠোনে অযাচিত কারও বুটের থপ থপ আওয়াজ শুনে চমকিত হলেন মা। জানালার ফাঁক দিয়ে ইশান তাকিয়ে দেখল– উঠোনে অস্ত্র তাক করে কয়েকজন মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। তারা কী সব বলাবলি করছে। তাদের সঙ্গে সুমনকেও দেখা গেল।

সুমনকে দেখে ইশান মনে মনে ভাবে–বিষয় কী! সুমনই ওদের নিয়ে এল নাকি? এত হিংসুটে ছেলে ও! এত জঘন্য ছেলে! সামান্য মোরগের লড়াইয়ে হেরে প্রতিশোধ নিতে মিলিটারি নিয়ে এসেছে। পরক্ষণে আবার ভাবল–ওর পক্ষে এটা আশ্চর্য কিছু না। কারণ ওর বাবা তখলুস মিয়াও তো এমনি লোক। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

ততক্ষণে মাও জানালার ফাঁক দিয়ে মিলিটারিদের দেখে ফেললেন। মা ভাবলেন–কিছু একটা অঘটন ঘটাতেই ওরা এসেছে। ভেবে তিনি মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে মা বললেন, 'বাবা ইশান! পরিস্থিতি ভালো ঠেকছে না রে বেটা। ঐ হায়েনাগুলো নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটাতে এসেছে। তুই বরং এক কাজ কর। পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যা। আমি এদিকটা সামলাই।'

মায়ের এরূপ কথায় ইশান কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। সে পেছনের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েও গেল। কিন্তু ততক্ষণে দুজন মিলিটারি ওদের ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে ওরা ইশানকে হাতেনাতে ধরে ফেলল। মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়ায় ইশানের মেরুদণ্ড দিয়ে যেন ভয়ের একটা শীতল প্রবাহ নেমে গেল। মনে মনে সে ভাবল–কী হবে এখন! ওরা কী তাকে মারবে! মারলে কীরকম মারতে পারে? খুব বেশি মারবে নাকি?

পরক্ষণে আবার ভাবল–ওদের তো বিশ্বাস নেই। পাকিস্তানি মিলিটারিরা হলো হায়েনার জাত। ওকে মেরেও ফেলতে পারে। মেরে ফেললে ওদের কিছু যাবে-আসবে না।

ইশানকে ওরা ধরে বাইরে নিয়ে এল। ঘরের ভেতর মা লুটিয়ে মরাকান্না কাঁদছেন। উঠোনের কোণে চিকেনচিকে হাঁটতে দেখা গেল। কক কক করে সে কিছু একটা খুটে খাচ্ছিল। ইশান ইশারায় চিকেনচিকে কিছু একটা বলল। কী বলল কে জানে। অমনি চিকেনচি উড়ে এসে সুমনের চোখমুখে একবার ভয়ংকর খামচি দিয়ে গেল। খামচি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

অমনি একজন মিলিটারি ওকে ধরতে গেল। কিন্তু চিকেনচিকে ধরা এত সহজ নাকি। চিকেনচি কক কক ডেকে এক উড়ালে ওদের মাথার ওপর দিয়ে প্রাচীরের ওপর গিয়ে বসল। তখন মিলিটারিটি প্রাচীরের ওপর থেকেই ওকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ধরতে পারল না। সে মুহূর্তে অন্যান্য মিলিটারিরা ইশানের কথা ভুলে চিকেনচিকে ধরাতেই অধিক মনোযোগ দিলো। ওরা অস্ত্র তাক করে ছুটে চলল চিকেনচির পিছু পিছু। চিকেনচি ওদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চিকেনচি ওদের ওপর দিয়ে, পায়ের ফাঁক দিয়ে এলোমেলো ছোটাছুটি করতে লাগল। আর মিলিটারিরা ওকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। এই বুঝি তারা চিকেনচিকে ধরে ফেলে। এই বুঝি ধরে ফেলল। কিছু ধরতে পারে না। চিকেনচি ওদের হাত ফসকে কয়েকবার ছুটে গেল।

মিলিটারিরা যখন চিকেনচিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, এই সুযোগে ইশান একলাফে দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল। দেয়াল টপকে সেও পালিয়ে গেল। চিকেনচির জন্যই বলা যায় ইশান প্রাণে বেঁচে গেল। কিন্তু চিকেনচিই বাঁচতে পারল না। ওকে ধরতে না-পেরে বিরক্ত হয়ে একজন মিলিটারি চিকেনচিকে গুলি করে দিলো। গুলিবিদ্ধ চিকেনচি সবুজ ঘাসের ওপর এসে আছড়ে পড়ল। অনেকক্ষণ তড়পাতে তড়পাতে একসময় সে শান্ত হয়ে গেল। ওর শরীরে সব রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চিকেনচির রক্তে যেন সবুজ ঘাসের বুকে লাল রঙের একটা সূর্য আঁকা হয়ে গেল। এ সূর্য বিজয়ের। এ সূর্য স্বাধীনতার।

ইশানের মা জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সেই লাল সূর্যটা দেখেন আর বিড়বিড় করে বলেন, 'হায় আফসোস! চিলের ঠোঁট থেকে তোকে প্রাণে বাঁচাতে পারলেও মিলিটারিদের হাত থেকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না!'

অনন্তস্বাধীন

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বঙ্গউদ্যানের
বৃন্তমূলে
ফুটে আছো
আজন্মস্বাধীন;
বিশ্বউদ্যানের মর্মমূলে
দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি অনন্তস্বাধীন;
তোমাকে পাহারা দেয় জলস্থলে
রাত্রিদিন
প্রাণী, ধ্যানী, কুমীর, হরিণ;
বাঙালি মুজিবজাতি,
জ্বেলেছে অবাক বাতি,
বাঙালিরা কোনোকালে
নয় পরাধীন।

উত্তরে পর্বতমালা, হিমশৈল,
গঙ্গাপদ্মা পলি-বহমান,
দক্ষিণে দরিয়াফণা,
সুন্দরবনের বাঘ,
ক্ষিপ্র গর্জমান;
পাখিরা ঠুকরে খায়
দশদিক থেকে আসা
অরি-দশানন;
অনন্তর ফুল-ফসলের বুকে
প্রজাপতি পরাগ-ভ্রমণ।

তুমি সেই পরাগের
মধু পেয়ে মধুকণ্ঠ আজ,
বিষামৃত পান করে
মাথায় পরেছো চিরজীবিতের তাজ,
সন্তানের সুমঙ্গল প্রত্যাশায়
চিরঞ্জীব শোণিতশরীর,
এ-বাংলার প্রতিকণা ভূমি জুড়ে
জেগে আছো চেতনামন্দির;
পিতা তুমি ত্রাতা তুমি
যুগে যুগে বিবর্তিত সব বাঙালির।

ইতিহাসপূর্ব যুগে এসেছিলে তুমি,
তারপর এসেছিলে বিলেঝিলে
নদীজলে, এ বাংলার নীলের নিখিলে;
বিহঙ্গের ভাষা তুমি শিখেছিলে,
শিখেছিলে প্রাণীদের ভাষা;
বিবর্তিত সেই ভাষা,
আ-মরি বাংলা ভাষা,
বাঙালির মাতৃভাষা
প্রাণী, ধ্যানী, জ্ঞানী আর
লোকবাঙালির ভালোবাসা।
ভাষার ভেতর থেকে
জেগে ওঠে জাতি,
জাতির ভেতর থেকে দেশ,
তোমার আমার দেশ বাংলাদেশ,
বাঙালির বহতা স্বদেশ।

তেতুলিয়া থেকে ছিরাদিয়া
পঞ্চগড় থেকে দরিয়ানগর,
জাফলং থেকে উড়ানির চর,
অনন্তর ভাষাপালে উড়ে যায়
বন্দরে বন্দরে কতো
সপ্তডিঙা নীল মধুকর;
যতদূর বাংলা ভাষা,
ততদূর বহমান বঙ্গের বন্দর;
তুমি সেই তরণীর মাঝি,
তুমি সেই সাম্পানের হাল,
উজান-ভাটিতে ডিঙ্গা
দাড় বায় সকাল বিকাল।
তুমি সেই জাহাজি মাস্তুল,
লালসবুজের পতাকার কূলউপকূল,
বাঙালির বাড়ানো সীমানা;
তুমি ডানা, সাতসমুদ্দুর ঘুরে আসা,
বাঙালির দিগ্বিজয়ী ডানা;
স্বর্গমর্ত্য ত্রিভুবন আজ
বাঙালির অশেষ ঠিকানা।

অভেদ সুন্দর
সেই ঘর বিশ্ববাঙালির ঘর;
সে ঘরে বসত করে
সর্বজয়ী বীর মানবিক;
তুমি সেই বীর-চূড়া,
মানবসম্মত চূড়া,
আর কোনো চূড়া নেই
তোমার অধিক।

বঙ্গউদ্যানের
বৃন্তমূলে
ফুটে আছো
আজন্মস্বাধীন;
বিশ্বউদ্যানের মর্মমূলে
দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি
অনন্তস্বাধীন
অনন্তস্বাধীন
অনন্তস্বাধীন।

কবিও সাঁতার জানে

দুখু বাঙাল

মানুষ বুভুক্ষু যদি, আমি গাছ– আমি এক পল্লবিত তরু
নদীজলে দোল খায় জ্যোৎস্নায় কবি এক চণ্ডীদাস, বড়ু।

মানুষ হলে একলাফে মরিপড়ি ঝাঁপ দিয়ে প্লাবিত জলে
চোখ বুঝে দিনমান ভাঙা যেত দুই কূল ঢেউ তুলে তুলে।

ইচ্ছেনদী– স্বৈরিণী, অবশেষে দ্বিধা হয়ে ভাসালে দুকূল
আমি তো চেয়েছি শুধু দোয়াব অঞ্চলজুড়ে শতবর্ণ ফুল।

কবিও সাঁতার জানে, যেই নদী বুকে ধরে কুসুমের ভেলা
কবির স্বভাব এই– বাকি সব ধারাপাত হাভাতেই গেলা।

মানুষ বুভুক্ষু যদি, আমি গাছ– আমি এক পল্লবিত তরু
নদীজলে দোল খায় জ্যোৎস্নায় কবি এক চণ্ডীদাস, বড়ু।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

সোহরাব পাশা

কালজয়ী ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় নাম
চির অম্লান– 'শেখ মুজিব'
আকাশে-বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে সেই নাম
'বঙ্গবন্ধু'
আলোড়িত হয় কলে-কারখানায়, নগরে-বন্দরে
আর কোলাহল মুখরিত গ্রামে, আলোড়িত হয়
দেয়ালে-পোস্টারে আর খোলা খামে–
আলোড়িত হয় রাখালের বাঁশের বাঁশিতে, উপচে পড়া
চাঁদের হাসিতে, ভাটিয়ালি গানে গানে;
আলোড়িত হয় গোলাপ ফোটার শব্দে

এই বাংলার কোথাও এক কণা মাটি নেই আর
এক ফোঁটা জল নেই যেখানে পড়েনি তোমার
উজ্জ্বল আঙুলের ছায়া আর দীপ্র ভালোবাসার
অমিয় অশ্রু-হাসি জেগে ওঠার অবিনাশী গান;

তোমার হাতেই ফুটেছে স্বপ্নগোলাপ
তুমি বাংলার রূপকার শ্রেষ্ঠ বাঙালি
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
চির অম্লান– অবিস্মরণীয় তোমার নাম।

স্বাধীনতা

আবুল হোসেন আজাদ

স্বাধীনতা
রক্তস্রোতের পিচ্ছিলে পথ হেঁটে
অমানিশার আঁধার গেলে কেটে
ভোরের সূর্যোদয়–

চৈতি হাওয়ায় পাখির খুশির ডানা
আকাশ ছুঁয়ে উড়তে যে নেই মানা
সে দুরন্ত নির্ভয়।

স্বাধীনতা
বুনোফুলের ভেসে আসা ঘ্রাণে
কী আনন্দে শুধু হৃদয় টানে
আজকে সারাবেলা–

প্রজাপতি মৌমাছিরা উড়ে
ফোটা ফুলের বনে ঘুরে ঘুরে
ভাসায় খুশির ভেলা–
আজ যে স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

তোমার জন্মই আজ আমাদের স্বাধীনতা
তুমি জন্মেছিলে তাই কবিতা সেজেছে স্বাধীনসত্তায়
আজ আলোকিত সমগ্র বাংলাদেশ
শতবর্ষ পরে টুঙ্গিপাড়ার সে ঘর থেকে।

বঙ্গবন্ধু, মধুমতী ছিল একটু বেশি স্রোতময়
যখন তোমার জন্মধ্বনি বেজেছে দুয়ারে?
দোয়েল, শালিক ছিল চঞ্চল ভীষণ
গাঢ় অক্সিজেন ছিল বাতাসে তখন?
ধুলোমাটি মেখে কৃষকের পথচলা
ছিল কি একটু দৃপ্ত সাহসে তখন?
বাতাস, নদীর ঢেউ, সবাই জানে, জানে সেই কৃষক
পথভোলা ক্ষণিক পথিক
টুঙ্গিপাড়ার বাতাস কেন এত আলোড়িত
তুমি জন্মেছিলে বলে
তুমি জন্মেছিলে বলে আজ হয়েছে আমাদের নিজস্ব পরিচয়
সে আমাদের বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার দৃপ্ত কবিতা

দেবকী মল্লিক

রেসকোর্সের ময়দানে উত্তাল জনসমুদ্রে
হাতে হাত রাখি মিলিবার তরে।
গভীর আকুতি নিয়ে লাখো জনতা
একটি 'ডাক' শোনার লাগি
কাতারে কাতারে ছুটিছে জীবনের মায়া ত্যাগী
সেই যে স্বাধীনতার অমৃত ধ্বনি–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'।
মুক্তিপাগল জনতার মনের মুকুরে বাঁধে বাসা
আগু-পিছু ভাববার নেই অবকাশ–
চেতনার মূলে আলোক দিশার পেয়েছে যে সন্ধান!
হাতে যার যা আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়
বসন্তের উতাল হাওয়ায় মত্ত শত্রুনিধনে
বিজয়ের জয়টীকা ললাটে শোভিত।
বাংলা মুক্ত–
বঙ্গবন্ধু তোমায় সেলাম।

স্বাধীনতা তুমি বাঙালি মানুষের

বাবুল তালুকদার

স্বাধীনতা বাংলার মানুষ আজ মুক্ত
লাল-সবুজের পতাকা প্রকৃতিজুড়ে
পতপত করে উড়ে
সারা বিশ্বে জয়ের ধ্বনি ছড়িয়ে
তুমি কি একবারও দেখতে পাও না স্বাধীনতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সংগীত–
'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'
প্রতিদিন উচ্চকণ্ঠে স্কুল ও কলেজের ছেলেমেয়েরা
কী মধুর সুরে ছন্দে-ছন্দে, তালে-তালে জয়ের ধ্বনি ছড়িয়ে–
আকাশে-বাতাসে
তুমি কি একবারও দেখতে পাও না স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি বাঙালি মানুষের হৃদয়গহীনে
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোমারই জয়ের গান গায় মানুষ
তোমাকে নিয়ে গর্ব কত অহংকার এই বাংলায়
তুমি কি একবারও দেখতে পাও না স্বাধীনতা।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা আজও বেঁচে আছে
শহিদ মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ এই বাংলার মাটিতে
তুমি কি ভুলে গেছো স্বাধীনতা? চুপ করে থেকো না আর
একাত্তরের লাল-সবুজের দেশ, মুক্তিযোদ্ধার দেশ
বিজয়ের দেশ, স্বাধীনতার দেশ বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা তুমি বাঙালি মানুষের
ঘরে ও বাহিরে প্রতিমুহূর্তে–
মানবের অন্তর গহীনে স্বাধীনতা চিরকালই থাকবে।
স্বাধীনতা, তুমি যে বাঙালি মানুষের
বাঙালি মা ও মাটির স্বাধীনতা।

একটি আঙুলের ইশারায়

ইজামুল হক

একটি আঙুলের ইশারায়
দুলে ওঠে
পদ্মা মেঘনা যমুনার জল।

একটি আঙুলের ইশারায়
সমগ্র রেসকোর্স জুড়ে
জ্বলে ওঠে দ্রোহের আগুন।
যে আগুন মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে
বাংলার প্রতিটি ঘরে।

একটি আঙুলের ইশারায়
জেগে ওঠে
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল।

একটি আঙুলের ইশারায়
মিছিলের নগরী হয়
প্রতিটি শহর।
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো
এই মন্ত্র বুকে নিয়ে
রাজপথে নেমে আসে
ছাত্র, শ্রমিক, মাঠের কৃষক, নৌকার মাঝি।

একটি আঙুলের ইশারায়
বদলে যায় সব।

ভালোবেসে যে ষোড়শী
রুমালে তোলে ফুল
হৃদয়ের আকুতি বেঁধে রাখে রঙিন সুতোয়–
'যাও পাখি বলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে'।
একটি আঙুলের ইশারায়
সেও একদিন ভুলে গেল
সেইসব ব্যক্তিগত স্বপ্নের কথা
মিশে গেল মুক্তিকামী মানুষের ভিড়ে।

গাঁয়ের যে ছেলেটি
বই ছাড়া বোঝে না কিছুই
থাকে না কারও সাতপাঁচে
নিরীহ বলেই সকলের কাছে যার পরিচয়
কেউ কেউ বইপোকা বলেও ডাকে
প্রতিটি শ্রেণিতে প্রথম হওয়াই যার
একমাত্র স্বপ্ন।
একটি আঙুলের ইশারায়
জয় বাংলা বলে
সেও একদিন ঘর ছাড়ে।

জীবনের স্বাদ বুঝে উঠবার আগেই
যেই মা; হারিয়ে ফেলে জীবনের সব রং
খোকা বড়ো হবে; মুছে যাবে সকল কষ্টের ক্ষত
এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে–
ফিরে আসে জীবনের কাছে।
খোকা যেন ভালো থাকে তাই
পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল থেকে
আঁচল আড়াল করে রাখে সারাক্ষণ।
একটি আঙুলের ইশারায়
সেই মাও বলে ওঠে একদিন
যাও বাবা, যুদ্ধে যাও–
দেশের জন্য তোমাকে দিলাম।

একটি আঙুলের ইশারায়
এভাবেই একদিন
পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয়
একটি দেশ, বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার দৃঢ়প্রত্যয়

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

এখানে এখন
জীবন জয়ের গান নীলসিয়া আসমান
শ্যামল বনানীর ছায়ে ছায়ে বেঁধেছে ঘর
আনন্দ-ঘন উচ্ছ্বাসে জীবনের কোলাহল।

এখানে এখন
জীবন কল্লোল জলতরঙ্গ নাচে হরদম
হৃদয় উত্তাল তরঙ্গঘাত
দোলা দেয় মনে দক্ষিণা সমীরণ
বসন্ত আজ এসেছে দুয়ারে
ফুল ফোটে আছে কাননে কাননে।

এখানে এখন
মৌসুমি ফল ধরে আছে থোকা থোকা
সবুজের মাঝে হলুদবর্ণ
আম-কাঁঠালের মেলা
দূরে কোনো পল্লব শাখে কোকিলের কুহুতান
যেন মধুর সুরে গান গেয়ে গেয়ে
চিত্ত করেছে প্রসার।

এখানে এখন
শত আয়োজন নতুনের অভিলাষ–
মাঠে মাঠে সোনালি ধানের আনন্দ হিল্লোল
কৃষক আর ধনীতে নেই ভেদাভেদ–
আনন্দ জোয়ার বয়ে চলেছে সব মানুষের ভেতর।

এখানে এখন
সাম্য-মৈত্রী বন্ধন মণিহার
হৃদয়ের সাথে হৃদয় মিশে আছে
অনাদিকালের পুলক সঞ্চার
সুখ-দুঃখ সব সেতুবন্ধন
এক সহোদর এক ভ্রাতৃময়
নেই হিংসা–নেই দ্বেষ
জীবন জয়ের মহা সংকল্প।

মুজিব মানে

সোহেল বীর

মুজিব মানে মহান নেতা 'বঙ্গবন্ধু' নাম
মুজিব মানে বজ্রকণ্ঠে মুক্তির সংগ্রাম।

মুজিব মানে সবার প্রাণে স্বাধীনতার আশা
মুজিব মানে একটি ভাষণ– ভীষণ ভালোবাসা।

মুজিব মানে বীর বাঙালির স্বপ্ন রাশি রাশি
মুজিব মানে বাংলা মায়ের ভুবনভোলা হাসি।

মুজিব মানে রক্তে কেনা একটি স্বাধীন দেশ
মুজিব মানে দৃপ্তকণ্ঠে শাবাশ বাংলাদেশ।

অন্তরে শিখা চিরন্তন

আবীর আহাম্মদ উল্যাহ

স্বাধীনতা তুমি
রক্তে কেনা ভূমি-ফুল-ফল
ছেলেহারা মায়ের
ভাইহারা বোনের
দুচোখে কান্নার অশ্রুজল।

স্বাধীনতা তুমি
বেদনার ঘনীভূত মেঘ,
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের
যুদ্ধে আত্মদানের
আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আবেগ।

স্বাধীনতা তুমি
মায়ের মুখের স্নিগ্ধ হাসি
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
দূরদৃষ্টির স্বপন
তোমায় বড়ো ভালোবাসি।

স্বাধীনতা তুমি
মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ অর্জন,
তোমার মহান বিজয়
থাকবে চির অক্ষয়
অন্তরে শিখা চিরন্তন।

একাত্তরের ছড়া

সানোয়ার রাসেল

মন ফিরে যায় একাত্তরে,
যুদ্ধ হবে যুদ্ধ!
রক্ত ঝরে শিমুল রাঙা
রক্তে মাটি শুদ্ধ।

পুড়ছে মায়ের নীল শাড়িটা
পুড়ছে বোনের লজ্জা,
হায়না নামে সোনার দেশে
দেশটা মৃত্যুশয্যা।

মরব কত, সইব না আর
এবার হবে মারতে,
আসছে মায়ের দামাল ছেলে
মুক্তিযুদ্ধ করতে।

লাখে লাখে শহিদ হলো,
ঝরলো কত রক্ত,
দেশটা শেষে স্বাধীন হলো
ডিসেম্বরের ওয়াক্ত।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৩

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বিবিএস দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন'।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৩ই মার্চ ২০২৩ ঢাকায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কনভেনশন সেন্টারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন –পিআইডি

জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশে বীমা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে যোগদানের মাধ্যমে বীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এদিনটি স্মরণে প্রতিবছর ১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালন বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি বীমা শিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব উল্লেখ করেন তিনি।

৭ই মার্চের ভাষণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। পুরো বাঙালি জাতি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবগাহন করেছিল রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর অমর কবিতা। মাত্র ১৮ মিনিটের এই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর শানিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণেই নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল শোষণমুক্তির কাঙ্ক্ষিত পথ। তাই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির মুক্তির মহাকাব্য। স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক নির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১লা মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। বাংলার মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর ভাষণে মূলত মানুষের মনের কথাগুলো ফুটে উঠেছিল। ইউনেসকো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

জাতীয় বীমা দিবসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীমা খাতের আরও উন্নয়নের জন্য এবং বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩-এর উদ্বোধন করেন। তিনি ১লা মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটির উদ্বোধন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারের প্রতিপাদ্য– 'বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাবো সবাই মিলে'।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে সরকার গত বছর 'জাতীয় বীমা দিবস'-কে 'বি' ক্যাটাগরি থেকে 'এ' ক্যাটাগরিতে উন্নীত করে। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। তারপর থেকেই তাঁর সরকার প্রতিবছর ১লা মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধন করেন –পিআইডি

গোপালগঞ্জে ৪৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নিজ জেলা গোপালগঞ্জের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ৩২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং অপর পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সাদুল্যাপুর ইউনিয়নের তালিমপুর তেলিহাটি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় তিনি বাটন চেপে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

৪৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে– পাইপলাইনে পানি সরবরাহের দুটি গ্রামীণ প্রকল্প। এর একটি টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়নে এবং অপরটি কোটালিপাড়া উপজেলার রামশিল ইউনিয়নে। গোপালপুর ইউপি অফিস-কাজুলিয়া ইউপি ভায়া বোরাইহাটি পোলশাইর বাজার সড়কে ২৪ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ ও কুশলি জিসি-ধারাবাশাইল জিসি ভায়া মিত্রাডাঙ্গা সড়কে ৯৯ মিটার গার্ডার ব্রিজ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সোনাখালি সড়ক, কোটালিপাড়ায় চারতলা বিশিষ্ট শুয়াগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কোটালিপাড়ায় শেখ হাসিনা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের তিনতলা বিশিষ্ট গার্লস হোস্টেল (একশো শয্যা), কোটালিপাড়া এসএন ইনস্টিটিউটের চারতলা বিশিষ্ট শিক্ষা ভবন, কোটালিপাড়া পৌর কিচেন মার্কেট ও কোটালিপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ, কোটালিপাড়া উপজেলার ভাঙ্গারহাট তালিমপুর-তেলিহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল লাইব্রেরি, কোটালিপাড়ায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক বাড়িতে 'মুক্তমঞ্চ', কোটালিপাড়ার উত্তর কোটালিপাড়া রামমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বড়ো বাজারে একতলা বাণিজ্যিক ভবনকে ১০ তলায় উন্নীতকরণ।

প্রধানমন্ত্রী গণপূর্ত বিভাগের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলা তথ্য কমপ্লেক্স ভবন ও কোটালিপাড়া মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের আওতায় রাধাগঞ্জ ইউনিয়ন ভাঙ্গারহাট বাজার উন্নয়ন ও কোটালিপাড়া উপজেলায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ম্যুরাল নির্মাণ এবং কোটালিপাড়া উপজেলা পরিষদের আওতায় ১১টি ইউনিয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে গেলেও তাঁর সরকার দেশের অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি। আমরা বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছি। একদিন এই বাংলাদেশ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাক্তার এস এ মালেক স্মরণে 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' আয়োজিত আলোচনাসভায় সরকারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের প্রবেশদ্বার হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ হবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের প্রবেশদ্বার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল। ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) তৃতীয় টার্মিনাল সম্প্রসারণের উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হাসান জাহিদ তুষার বলেন, প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিতে ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা গ্রহণে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ এবং কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ এবং রানওয়ের সম্প্রসারণের চলমান কাজের কথা উল্লেখ করেন।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে জ্বালানি রিফুয়েলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা গেলে আন্তর্জাতিক রুটের দৈর্ঘ্য কমে যাবে। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো জ্বালানি নিতে কক্সবাজারে এলে, দেশের রাজস্ব আয়ও বাড়বে। এছাড়া হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে সবকিছুই ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পরিচালিত হবে, যাতে মানুষ খুব দ্রুত এবং সহজে আন্তর্জাতিক মানের সেবা পেতে পারে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রেস কাউন্সিল আরও শক্তিশালী হবে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, যুগের প্রয়োজনে প্রেস কাউন্সিল আরও শক্তিশালী হবে, অনলাইন পত্রিকাগুলোও এর আওতায় আসবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে রাজধানীর তোপখানা রোডে কাউন্সিলের মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভায় তিনি একথা বলেন। এর আগে কাউন্সিল চত্বরে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী।

প্রেস কাউন্সিলের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র ন্যায়নীতি ও যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে পরিচালনা ও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত গভীরে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং একইসঙ্গে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা যাতে একটি জুডিসিয়াল বোর্ডের কাছে গিয়ে তাদের অনুযোগ উপস্থাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি প্রেস কাউন্সিল গঠন করেন। যুগের সাথে গণমাধ্যমের বহুমাত্রিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রেস কাউন্সিল তার ৪৯ বছরের পথচলায় দেশে সংবাদপত্রের সাথে জনগণের, পাঠকের সাজুয্য ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজকে সংবাদমাধ্যম শুধু প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যখন প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তখন অনলাইন গণমাধ্যম ছিল না এবং এত সংবাদপত্রও ছিল না। ফলে প্রেস কাউন্সিল তার আইনানুসারে সংবাদপত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে না। অনলাইন পত্রিকা ও পত্রিকার অনলাইন ভার্সনগুলোকে আওতায় আনা এবং প্রেস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাউন্সিলের সদস্যরাই কয়েক বছর ধরে অংশীজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে একটি খসড়া আইন চূড়ান্ত করেছেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রেস কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্য সাংবাদিক, সাংবাদিক সংগঠনের নেতা এবং পত্রিকার সম্পাদক। তারাই এটি চূড়ান্ত করেছেন।

বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এখন ফেসবুক পেইজ খুলে সেটিকেও গণমাধ্যম হিসেবে প্রচার করা হয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আবার সাংবাদিক পরিচয় দেয়। গ্রামগঞ্জে এখন যে ভুঁইফোড় অনলাইন পোর্টাল, ভুঁইফোড় ফেসবুক, আবার একটা ক্যামেরা নিয়ে ঐটাই একটা মিডিয়া– এটিই বাস্তবতা। ফলে কোনটি প্রকৃত সংবাদমাধ্যম এবং কে সাংবাদিক, তা নিয়ে বিরাট বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এগুলোর একটা সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। যারা সত্যিকারের সাংবাদিক তারা এর সাথে কখনই যুক্ত নয়। সাংবাদিকরাও চায় এগুলো থেকে মুক্তি। সাংবাদিক সংগঠনগুলোর দাবিও এটি। আমি আপনাদের দাবির সাথে একাত্ম। এজন্য সাংবাদিকদের তালিকা প্রণয়ন প্রয়োজন। প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়েই এটি করা বাঞ্ছনীয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার গণমাধ্যমবান্ধব সরকার। বাংলাদেশে গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে সেটি অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ। আমরা মনে করি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৭ই মার্চ ২০২৩ ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আলোচনাসভা, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

এবং বিকাশ অপরিহার্য। সে লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সরকার কাজ করছে।

নিজের ভাষায় পরিপক্বতার পরই অন্য ভাষা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, নিজের ভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষা শেখা আধুনিকতা নয়। তিনি বলেন, অবশ্যই বিশ্বায়নের এই যুগে অন্য ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু তা নিজের ভাষায় পরিপক্বতার পরই। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শাহবাগে ঢাকা ক্লাবের প্রধান লাউঞ্জে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩' উপলক্ষে ক্লাব কর্তৃপক্ষ আয়োজিত 'বাংলা আমার প্রাণ' আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে চলেছি, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমরা বাঙালিরা আগে থেকেই অনেক সমৃদ্ধ। এসময় তিনি ইউরোপের বাইরে সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গাছের প্রাণ আবিষ্কার বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমুখ বিশ্বখ্যাত বাঙালিদের উদাহরণ তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরই আমাদের পূর্বসূরিরা অনুধাবন করেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে বাঙালিদের মুক্তি নিহিত নেই। সেই কারণেই ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম বছরপূর্তি ১৪ই আগস্টের দুই দিন আগে তৎকালীন তরুণ নেতা শেখ মুজিব একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেই বিবৃতি তৎকালীন *ইত্তেহাদ* ও অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা এবং লিফলেট আকারেও প্রচার হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ১৪ই আগস্ট আনন্দ-উল্লাসের দিন নয়। অত্যাচার-নিপীড়নের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার শপথ নেওয়ার দিন হিসেবে ১৪ই আগস্ট পালনের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, তরুণ নেতা শেখ মুজিব অনুধাবন করেছিলেন, যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তার সংখ্যাগুরু বাঙালিদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে চায় না, কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অবদমিত করে রাখতে চায়, যে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ১০ জনের মন্ত্রিসভায় বাঙালি ছিল মাত্র একজন, ফজলুর রহমান সাহেব যিনি আমাদের সালমান এফ রহমান ভাইয়ের বাবা, অথচ বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগুরু এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে অনেক উন্নত, সেখানে বাঙালির মুক্তি নেই। তিনি বলেন, সেই অনুধাবন থেকেই কায়দে আযম জিন্নাহর একতরফা উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধুসহ আরও কয়েকজন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় এ নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে, যে পথ বেয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধিকার আন্দোলনের এই সূচনার পর দুই দশকের সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। স্মরণ করি, কানাডা প্রবাসী আরেক সালাম ও রফিকের উদ্যোগ ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক চূড়ান্ত তৎপরতায় জাতিসংঘে আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

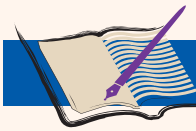

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এমবিবিএস ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ পরীক্ষায় পাসের হার ৩৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। ১২ই মার্চ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। এবার পাস করেছেন ৪৯ হাজার ১৯৪ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ২৮ হাজার ৩৮১ জন এবং ছেলে শিক্ষার্থী ২০ হাজার ৮১৩ জন।

উল্লেখ্য, ১০ই মার্চ সারা দেশে একযোগে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এমবিবিএস পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, সারা দেশে ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এবার শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আসন ছিল ৪ হাজার ৩৫০টি। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রথম ৪ হাজার ৩৫০ জন এসব কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। উত্তীর্ণ বাকি শিক্ষার্থীরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবেন। সারা দেশে ৭১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এবার শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য মোট আসন রাখা হয়েছে ৬ হাজার ৭৭২টি।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২২-এর ফলাফল ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ প্রকাশ করা হয়। কারিগরি ত্রুটির কারণে ফলাফল পুনঃযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় প্রকাশিত ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করা হয়। ফলাফল সংশোধন করে ১লা মার্চ পুনরায় প্রকাশ করা হয়।

এ বছর মোট বৃত্তি পেয়েছে ৮২ হাজার ৩৮৩ জন। এদের মধ্যে ট্যালেন্টপুলে (মেধাবৃত্তি) ৩৩ হাজার জন এবং ৪৯ হাজার ৩৮৩ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে।

প্রায় একযুগ পর আলাদা করে পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় ২০২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। সারা দেশে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৭৫৯ জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

তিতাসের সব সেবা এক অ্যাপেই

তথ্যপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার উদ্যোগ নিয়েছে গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তিতাস গ্যাস ও ট্রান্সমিশন কোম্পানি। পেট্রোবাংলার প্রতিষ্ঠানটি একটি অ্যাপে তথ্য ও সেবার সম্মিলন করেছে।

অ্যাপে তিনটি উইন্ডো রয়েছে– ইনডেক্স, ফোনবুক, বিল পে। ইনডেক্সে রয়েছে– তিতাস গ্যাস কোম্পানি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য, যেমন: তিতাস গ্যাসের ভিশন ও মিশন, মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, পরিচালনা পর্ষদ, তিতাসের অধিভুক্ত এলাকা, পাইপলাইন

পরিসংখ্যান, গ্রাহক পরিসংখ্যান, মার্কেট শেয়ার, ক্যাটাগরি অনুযায়ী গ্যাস বিক্রয় ইত্যাদি। গ্রাহক প্রয়োজনীয় তথ্য ইনডেক্স উইন্ডো থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

ফোনবুক উইন্ডোতে রয়েছে– তিতাসের সব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফোন নম্বর। প্রধান অফিস থেকে শুরু করে আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তাদের নম্বরও রয়েছে এতে। যে-কোনো তথ্যের প্রয়োজনে বা অভিযোগ জানাতে সেবা প্রত্যাশীরা এখান থেকে নম্বর সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিল পে উইন্ডোর মাধ্যমে মিটার ও নন-মিটার গ্রাহকরা গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারবেন। ফলে বাড়তি কোনো ঝামেলা নেই। অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে এবং তিতাস গ্যাসের কল সেন্টারে কল করার মাধ্যমে রয়েছে অভিযোগ করার সুবিধাও। অপরদিকে তিতাস গ্যাসের কল সেন্টার ১৬৪৯৬-এ কল করেও অভিযোগ করা যাবে এবং তিতাস গ্যাস সম্পর্কিত যে-কোনো তথ্যসেবা কল সেন্টার থেকে পাওয়া যাবে।

অ্যাপের অন্য সুবিধাগুলো হলো: মিটার ও নন-মিটার (আবাসিক) গ্রাহকরা গ্রাহক পোর্টালে প্রবেশ করে বিল সম্পর্কিত তথ্য দেখতে পারবেন। প্রি-পেইড গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজনীয় ফাইল যেমন– ব্যবহার বিধি, জরুরি যোগাযোগ, রিচার্জ সেন্টারের তালিকা, মিটার হারানো ও ডিমান্ড কার্ডের আবেদন দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবেন। নির্দেশনা অংশে বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির ফর্ম/তথ্য দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন। 'তিতাস গ্যাস' নামের অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহক ও সেবা প্রত্যাশীরা।

বৈদ্যুতিক যানের নীতিমালা চূড়ান্ত

বৈদ্যুতিক যেসব যান বর্তমানে সড়কে চলছে, সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট নিরাপদ মডেলে রূপান্তর করতে হবে। বৈদ্যুতিক মোটরযান নিবন্ধন ও চলাচল সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালায় এমন বাধ্যবাধকতা থাকছে। বৈদ্যুতিক মোটরযান নিবন্ধন ও চলাচল সংক্রান্ত এই নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়েছে সড়ক, পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়।

নীতিমালায় বৈদ্যুতিক মোটরযান বলতে বাস, ট্রাক ও ব্যক্তিগত গাড়িকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনিরাপদ যান প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, বিদ্যমান অনিরাপদ ইলেকট্রিক মোটরযান কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরাপদ মডেলে রূপান্তর করতে হবে। অন্যথায় তা সড়কে চলাচল করতে পারবে না।

প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাটারিচালিত সাইকেল, রিকশা, রিকশাভ্যান বৈদ্যুতিক যান বলে বিবেচিত হবে না। জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে ধীরগতির বৈদ্যুতিক মোটরযান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। খসড়ায় ধীরগতি বলতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার বেগে চলাচলকারী যানবাহনকে বোঝানো হয়েছে।

নীতিমালার ভূমিকায় বলা হচ্ছে, জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর মোটরযান থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক ভেহিকল (ইভি) ব্যবহারের গুরুত্ব বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিবহণ খাত থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩.৪ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাস করার অঙ্গীকার করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহণ খাতে ব্যবহৃত যানবাহনের ন্যূনতম ৩০ শতাংশ ইলেকট্রিক মোটরযানে রূপান্তর করতে হবে। সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮-এর ১২৪ ধারা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

'ব্র্যাক কুমন' শিক্ষা পদ্ধতি আগামী প্রজন্মকে দক্ষ করে তুলবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আধুনিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'ব্র্যাক কুমন' শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে তিনটি সম্পদ আছে যা বিতরণ করলে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৭ই মার্চ ২০২৩ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিসিসি অডিটোরিয়ামে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার 'তর্জনী'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

ও অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করলে কমে যায় না বরং বৃদ্ধি পায় তাহলো– ভালোবাসা, সম্মান ও জ্ঞান। তাই গণিত ও ইংরেজির ভীতি দূর করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে আফটার স্কুল লার্নিং পদ্ধতি আগামী প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় দক্ষ করে তুলবে।

২৮শে ফেব্রুয়ারি নাটোরের সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজে তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর ও ব্র্যাক কুমন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে দেশের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবগুলোতে জাপানি

আফটার স্কুল শিক্ষা পদ্ধতি 'ব্র্যাক কুমন'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে ডিজিটাল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী ২০৩১ সালের মধ্যে ৩৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে কুমন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে জানিয়ে বলেন, ব্র্যাক কুমন পদ্ধতি, শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি লার্নিং ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উৎসাহিত করবে। প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রতিষ্ঠার ১৬তম বর্ষে ৬১ দেশে ২৪ হাজার সেন্টার আছে কুমনের। পরে প্রতিমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে 'কুমন জাপানি লার্নিং মেথড'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

দেশে সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সারের বছরে উপার্জন দেড় বিলিয়ন ডলার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, দেশে বর্তমানে সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন, যারা বছরে দেড় বিলিয়ন ডলার উপার্জন করছেন। ২০২৫ সালে আরও ১০ লাখ নতুন ফ্রিল্যান্সার তৈরি হবে এবং উপার্জন পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

৩রা মার্চ নাটোরের সিংড়ায় গোল-ই-আফরোজ সরকারী কলেজ মাঠে আইসিটি ফ্রিল্যান্সিং ক্যাম্প উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুনাইদ আহমেদ এ কথা বলেন। ক্যাম্পে উপজেলার ৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধিত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভাষণে স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দিতে প্রত্যেক যুবককে চাকরি প্রদানের কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা এবং ডিজিটাল আর্কিটেক্ট সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরিকল্পনায় সোনার বাংলার আধুনিক রূপ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। আজকের পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্বে আসীন হবেন। তাদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে সরকার কার্যকর সব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থীকে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরবর্তী ছয় মাসে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই কার্যক্রমে সফলতা পেলে সিংড়া মডেল সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

গণবিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্মানিত যাত্রী সাধারণের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে রেলওয়ের আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেটিং ব্যবস্থা ও অনলাইনের মাধ্যমে ক্রয়কৃত টিকেট অনলাইনে রিফান্ড এর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যা ১ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

যাত্রীদের প্রতি নির্দেশনা ও শর্তাবলী ঃ

- মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে BR<space>NID নম্বর <space> জন্ম তারিখ (জন্ম তারিখের ফরম্যাট-জন্ম সাল/মাস/দিন) লিখে ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস প্রেরণ করতে হবে। ফিরতি এসএমএস-এর মাধ্যমে নিবন্ধন সফল বা ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা জানিয়ে দেওয়া হবে।
- https://eticket.railway.gov.bd ওয়েসাইট অথবা rail sheba app এ সঠিক NID নম্বর ও জন্ম তারিখ verify পূর্বক অন্যান্য তথ্য প্রদান সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
- বিদেশী নাগরিকগণ পাসপোর্ট নম্বর প্রদান ও পাসপোর্টের ছবি আপলোড করার মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।
- ১২-১৮ বছর বয়সী যাত্রীগণ জন্মনিবন্ধন নম্বর প্রদান ও জন্মনিবন্ধন সনদ আপলোড করার মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।
- সফলভাবে এনআইডি/পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধন যাচাই পূর্বক নিবন্ধন ব্যতীত কোনো যাত্রী আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট ক্রয় করতে পারবেন না।
- ভ্রমণকালে যাত্রীকে অবশ্যই নিজস্ব এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি অথবা পাসপোর্ট/ছবি সম্বলিত আইডি কার্ড সাথে রাখতে হবে।
- টিকেটের উপরে মুদ্রিত যাত্রীর নাম ও NID নম্বর যাত্রী কর্তৃক প্রদর্শিত পরিচয়পত্রের সাথে না মিললে যাত্রীকে বিনা টিকেট ভ্রমণ-এর দায়ে অভিযুক্ত করা হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী জরিমানাসহ ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- একজন যাত্রী রেল সেবা অ্যাপ বা রেলওয়ের টিকেটিং ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ক্রয়কৃত টিকেট অনলাইনে রিফান্ড করতে পারবে। এক্ষেত্রে টিকেট ক্রয়ের সময় যে পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করা হবে, সেই একই পেমেন্ট গেটওয়ে'র মাধ্যমে রিফান্ড সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে
আপনার আস্থাই আমাদের অনুপ্রেরণা

জি-৪২৩/০২/২৩ (৫ x ৪)

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

'টিকেট যার, ভ্রমণ তার' নীতিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন রেলযাত্রীরা

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবহার করে 'টিকেট যার, ভ্রমণ তার' নীতিতে ট্রেনের টিকেট বিক্রি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১লা মার্চ থেকে এ নিয়মে ট্রেনে যাতায়াত করছে যাত্রীরা। যাত্রীরা নিয়ম মেনে এনআইডি ব্যবহার করে টিকেট কাটছেন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আন্তঃনগর ট্রেনগুলোতে এ প্রক্রিয়া চালু করেছে। নতুন এ নিয়ম পুরোপুরি বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছেন রেলওয়ের কর্মকর্তারা। এজন্য রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে ছয়টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ছয়টি টাস্কফোর্স কাজ শুরু করেছে।

'টিকেট যার, ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট কেনার আগে প্রত্যেক যাত্রীকে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর বা জন্মনিবন্ধন সনদ যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করেছে।

বিদেশি নাগরিকেরা পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে ও পাসপোর্টের ছবি আপলোড করার মাধ্যমে নিবন্ধন করবেন। ভ্রমণকালে যাত্রীকে অবশ্যই নিজস্ব এনআইডি বা জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি অথবা পাসপোর্ট/ছবি সংবলিত আইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে। পরিচয়পত্রের সঙ্গে টিকিটের ওপর মুদ্রিত যাত্রীর তথ্য না মিললে যাত্রীকে বিনা টিকেটে ভ্রমণের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্টেশনগুলোতে সর্বসাধারণের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার জন্য একটি করে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

পণ্য রপ্তানিতে দিল্লি বিমানবন্দর ব্যবহার করবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে যাবে দিল্লি বিমানবন্দর হয়ে। এতে দুই দেশই উপকৃত হবে এবং পরিবহণ খরচও কমে আসবে। দক্ষিণ এশিয়ায় দিল্লি বিমানবন্দরই সবচেয়ে বড়ো কার্গো হাব। এরই মধ্যে ৩রা মার্চ বাংলাদেশ থেকে যাওয়া এই ট্রান্সশিপমেন্ট কার্গোর প্রথম ব্যাচকে স্বাগত জানিয়েছে দিল্লি বিমানবন্দর। ভারতীয় গণমাধ্যম *ইন্ডিয়া টুডে*র এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭ই ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত অনুমোদন পেয়েছে দিল্লি বিমানবন্দর। এর ফলে এখন থেকে দিল্লি বিমানবন্দর বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের কার্গো ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে কাজ করবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে কার্গোর প্রথম ব্যাচ দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়।

৩রা মার্চ দিল্লি বিমানবন্দর থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে পাঠাতে দিল্লি বিমানবন্দর প্রাণকেন্দ্র হতে চলেছে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও বোঝাপড়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, তাঁতপণ্য, চামড়াজাত দ্রব্য, জুতা, পাটজাত বিভিন্ন পণ্য ও ওষুধ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আকাশপথে পাঠানোর ক্ষেত্রে দিল্লি হয়ে উঠতে যাচ্ছে নতুন ঠিকানা।

দিল্লি বিমানবন্দরে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। পণ্য তল্লাশির জন্য বসানো হয়েছে এক্সরে যন্ত্র। এই ব্যবস্থায় দিল্লি বিমানবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য দ্রুত কম খরচে পৌঁছে যাবে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও যুক্তরাষ্ট্রে।

১৫৬ কোটি ডলার প্রবাসী আয় ফেব্রুয়ারিতে

ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫৬ কোটি ১২ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১০৭ টাকা ধরে) ১৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা। গত বছরের এই মাসে ১৪৯ কোটি ৪৫ লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছিল। ১লা মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে রেমিটেন্স এসেছিল ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ মার্কিন ডলার। তবে জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে রেমিটেন্স কম এলেও চলতি অর্থবছরের আট মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি রেমিটেন্স এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে মোট এক হাজার ৪০১ কোটি ৩৩ লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল এক হাজার ৩৪৩ কোটি ৮৫ লাখ মার্কিন ডলার। সে হিসাবে ৫৭ কোটি ৪৮ লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স বেশি এসেছে চলতি অর্থবছরে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

এএফসির এলিট প্যানেলে নাম লেখালেন সালমা

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) এলিট প্যানেলে বাংলাদেশের প্রথম নারী রেফারি হিসেবে নাম লিখিয়েছেন সালমা আক্তার। ২০শে ফেব্রুয়ারি এএফসি থেকে সালমার এলিট প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া পর্যায়ের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নিয়মিত ম্যাচ পরিচালনা করেছেন সালমা আক্তার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে প্রথম নারী রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন তিনি। পেয়েছেন ফিফার সহকারী রেফারির স্বীকৃতি। এএফসির এলিট প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির ফলে এবার তিনি দায়িত্ব পাবেন এশিয়ার সেরা দেশগুলোর বড়ো বড়ো ম্যাচ পরিচালনার। উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ায় গত ১৬-১৯শে জানুয়ারি এএফসির এলিট প্যানেলের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই নারী রেফারি– জয়া চাকমা ও সালমা আক্তার। সালমা আক্তার উত্তীর্ণ হয়ে এ সম্মাননা পেলেন।

অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার পেলেন শাহনাজ মুন্নী

এবছর অনন্যা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি ও কথাসাহিত্যিক শাহনাজ মুন্নী। গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় অনন্য অবদানের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। শাহনাজ মুন্নী গেল শতকের নব্বই দশক থেকে সক্রিয়ভাবে লেখালেখি করছেন। পেশা জীবনে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত।

কুমিল্লায় প্রথম নারী সিভিল সার্জন

কুমিল্লায় প্রথম নারী সিভিল সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ডা. নাছিমা আক্তার। ১লা ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের এক

চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। ডা. নাছিমা আক্তার এর আগে নড়াইল জেলার সিভিল সার্জন ছিলেন।

মহাকাশে যাচ্ছেন সৌদি নারী নভোচারী

এবছরের শেষ নাগাদ মহাকাশে প্রথম নারী নভোচারী পাঠাতে যাচ্ছে সৌদি আরব। ৩৩ বছর বয়সি রায়ানা বারনাওমি হচ্ছেন সেই নারী নভোচারী। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) রায়ানার সঙ্গী হচ্ছেন সৌদি পুরুষ নভোচারী আলি আল কারনি। রায়ানা ও আলি এএক্স-২ মহাকাশ মিশনে অবস্থানরত নভোচারীদের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র' উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করেন –পিআইডি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা

কৃষি মন্ত্রণালয় ১লা মার্চ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। পরে প্রজ্ঞাপনের গেজেট জারি করেছে সরকার।

উল্লেখ্য, ৯ই জানুয়ারি মন্ত্রিসভা বৈঠকে পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

এসময় মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পাটের আঁশের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেন। এখন থেকে পাট হবে কৃষিজাত পণ্য।

বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র উদ্বোধন

গাজীপুরে বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো' কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৩শে ফেব্রুয়ারি গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্ভাবন ঘুরে ঘুরে দেখেন। পরে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এর আগে তিনি বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ব্রি'র ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

রোপা আমন ধান কাটায় ১১৯ কোটি টাকা সাশ্রয়

রোপা আমন মৌসুমে সারা বাংলাদেশে কম্বাইন হারভেস্টার ব্যবহারে কৃষকের মোট অর্থ সাশ্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১১১৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা। ৫ই মার্চ সংবাদ মাধ্যমকে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে শ্রমিকের মাধ্যমে ১ একর জমির ধান কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াইয়ে খরচ হয় ১১ হাজার ৮০০ টাকা। কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ১ একর জমির ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়ায় খরচ হয় মাত্র ৬ হাজার টাকা (সব খরচ মিলিয়ে)। অর্থাৎ কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে প্রতি একর জমিতে লাভ হয় ৫ হাজার ৮০০ টাকা। কম্বাইন হারভেস্টারের ফসল কর্তন-পরবর্তী অপচয় ২-৩ শতাংশ– যা সনাতন পদ্ধতিতে ১০-১২ শতাংশ।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের সমর্থন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের অব্যাহত সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২৪শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মহাসচিব একথা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসাধারণ উন্নয়নের গতিধারার প্রশংসা করে মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশ আগামী বছরগুলোতে বিশেষ করে এসডিজি অর্জনে আরও সাফল্য অর্জন করবে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শীর্ষ সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের ধারাবাহিক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন তিনি। সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের ওপর গৃহীত রেজুলেশনের পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা সংকট এবং সম্ভাব্য উত্তরণের উপায় নিয়েও আলোচনা করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মহাসচিব। তারা এ সংকট সমাধানে আসিরানের কার্যকর নেতৃত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহাসচিব ১.২ মিলিয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান ১০ই মার্চ রাজধানীতে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফেরাতে জাতিসংঘের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

আইসিডিডিআরবির নতুন ওয়েবসাইট

জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য জানাতে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) নতুন একটি ওয়েবসাইট খুলেছে। যেটি জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ রিসোর্স হিসেবে কাজ করবে। ইউএসআইডির রিসার্চ ফর ডিসিশন মেকারর্সের (আরডিএম) ও ডেটা ফর ইমপ্যাক্ট (ডি৪১) সহায়তায় ওয়েবসাইটটি চালু করা হয়েছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মহাখালীতে আইসিডিডিআরবির সেমিনারে ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফরম https:llcch.icddrb.org/ প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

একটি মানুষও ভূমিহীন-গৃহহীন থাকবে না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশে একটি মানুষও ভূমিহীন-গৃহহীন থাকবে না। ইতোমধ্যে ৩৫ লাখ মানুষ ঘর পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে আরও ৪০ লাখ মানুষ ঘর পাবে। ১১ই মার্চ ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক সার্কিট হাউস মাঠে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, করোনাকালে মানুষকে আমরা বিনা পয়সায় করোনার টিকা দিয়েছি। তা এখনও দিয়ে যাচ্ছি। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। বাবা-মা-ভাই সবাইকে হারিয়েছি। শুধু মানুষের কথা চিন্তা করে এখনও কাজ করে যাচ্ছি। মানুষের জন্য আমাদের কাজ করাই মূল লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ঘরে ঘরে ভাতা দিয়েছি। আমরা চাই দেশের প্রত্যেকটা মানুষ যেন উন্নত জীবন পায়। এক কোটি মানুষকে আমরা মাত্র ৩০ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারার সুযোগ করে দিয়েছি। অনেককে ১০ টাকা কেজিতে চাল দিচ্ছি। আবার যাদের একেবারে সামর্থ্য নেই তাদের বিনামূল্যে চাল দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই, কোনো মানুষ কষ্ট না পাক।

৬২ হাজার পরিবারে কৃষি উপকরণের কার্ড

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সিংড়ায় ৬২ হাজার ২৫০ জন পরিবারকে কৃষি উপকরণের কার্ড দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সিংড়া উপজেলা হলরুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় ১২শো জন কৃষকের মাঝে পাট বীজ বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ৬৮ হাজার ৫২০টি পরিবারকে ডিজেলের পরিবর্তে টাকা এবং বিভিন্ন কৃষি প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ৪৮ হাজার ১৮৮ জন কৃষক বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ভর্তুকিতে প্রণোদনা পাচ্ছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের কৃষি ব্যবস্থা সমৃদ্ধ। কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ বিতরণ করছেন। কৃষকরা সার, তেল ও সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে। বিনা পয়সায় কৃষকরা জমিতে পানি দিতে পারছেন। শুষ্ক মৌসুমে কৃষকরা খাল থেকে সেচ ব্যবস্থা পাচ্ছে। এবছর সিংড়ায় রেকর্ড পরিমাণ সরিষার আবাদ হয়েছে। ৪ হাজার ৬২০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীনতার মাসে মুক্তিযুদ্ধের দুই সিনেমা

স্বাধীনতার মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পেল মুক্তিযুদ্ধের দুই সিনেমা– *ওরা ৭ জন* ও *জেকে ১৯৭১*। *ওরা ৭ জন* নির্মাণ করেছেন খিজির হায়াত খান। মুক্তিযুদ্ধের ৫ নম্বর সেক্টরের একটি গল্প তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায়। *ওরা ৭ জন* ছবিটি একই সঙ্গে দেশের ২৬টি সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে যা সাম্প্রতিক সিনেমাগুলো তো বটেই, যুদ্ধভিত্তিক সিনেমার ক্ষেত্রেও বড়ো সংখ্যা। এই সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন– ইন্তেখাব দিনার, জাকিয়া বারী মম, খিজির হায়াত খান, সাইফ খান, ইমতিয়াজ বর্ষণ, নাফিস আহমেদ প্রমুখ।

জেকে ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধের বহু ঘটনা এ প্রজন্মের আড়ালে রয়ে গেছে। সে রকম একটি ঘটনাই ক্যামেরায় তুলে আনলেন নির্মাতা ফাখরুল আরেফিন খান তার *জেকে ১৯৭১* সিনেমায়। এটি বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সিনেমা। দেশের ৭টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি।

২১শে পদক ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান করেন। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৯শে ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক তুলে দেন। অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেনঃ এবার ভাষা আন্দোলন ক্যাটাগরিতে তিনজন এই পদক পেয়েছেন। তাঁরা হলেন খালেদা মনযুর-ই-খুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম শামসুল হক (মরণোত্তর) ও হাজি মো. মজিবর রহমান।

শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণিতে আটজন এই পদক পেয়েছেন। অভিনয়ে পেয়েছেন মাসুদ আলী খান ও শিমূল ইউসুফ। সংগীতে মনোরঞ্জন ঘোষাল, গাজী আবদুল হাকিম ও ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর)। আবৃত্তিতে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, শিল্পকলায় নওয়াজীশ আলী খান, চিত্রকলায় কনকচাঁপা চাকমা।

মুক্তিযুদ্ধে মমতাজ উদ্দীন (মরণোত্তর), সাংবাদিকতায় মো. শাহ আলমগীর (মরণোত্তর), গবেষণায় মো. আবদুল মজিদ, শিক্ষায় অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম (মরণোত্তর) ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সমাজসেবায় বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ও মো. সাইদুল হক, রাজনীতিতে মঞ্জুরুল ইমাম (মরণোত্তর) ও আকতার উদ্দিন মিয়া (মরণোত্তর) এবং ভাষা ও সাহিত্যে ড. মনিরুজ্জামান একুশে পদক পেয়েছেন।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ

ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো ইংলিশদেরকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ। ১৪ই মার্চ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে তাদেরকে ১৬ রানে হারায় টাইগাররা। টি-টোয়েন্টিতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দল ইংল্যান্ড। তাদের বিপক্ষে এর আগে কোনো সিরিজেই জেতেনি বাংলাদেশ। তবে এবার প্রথমে সিরিজ জয়, এরপর হোয়াইটওয়াশ করার গৌরব অর্জন করল তারা। মিরপুরে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৫৮ রান করে বাংলাদেশ। ১৫৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৪২ রান করে ইংল্যান্ড। ফলে ১৬ রানের জয় পায় বাংলাদেশ। ম্যাচ সেরা হয়েছেন লিটন দাস। অপরদিকে সিরিজ সেরা হন নাজমুল হাসান শান্ত।

৩০০ উইকেটের মাইলফলকে সাকিব আল হাসান

প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে ৩০০ উইকেট শিকারের রেকর্ড করেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ৬ই মার্চ চট্টগ্রামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে এই মাইলফলক অর্জন করেন এই অলরাউন্ডার। এই ম্যাচে তিনি চার উইকেট নেন। বিশ্বের ৬ষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে সাকিব ৩০০ বা তার বেশি উইকেট শিকারিদের ক্লাবে নাম লেখালেন। ওয়ানডেতে ৩০০ উইকেট শিকারি একমাত্র বর্তমান ক্রিকেটার তিনি। ২২৭ ম্যাচ খেলে তিনি এই রেকর্ড করেছেন। এছাড়াও এই অলরাউন্ডার এখন

ওয়ানডেতে সর্বাধিক উইকেটসহ সর্বকালের সেরা বোলারদের তালিকায় ১৪তম স্থানে রয়েছেন।

কাবাডিতে আর্জেন্টিনাকে হারালো বাংলাদেশ

কেউ কুস্তিগির, কেউ শাটলার। কেউ আবার হর্স রাইডার। কেউ খেলেছেন ফুটবলও। এরকম বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি করা দল নিয়ে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট খেলতে ঢাকায় এসেছে আর্জেন্টিনা। বঙ্গবন্ধু কাপ তৃতীয় কাবাডি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইরাকের কাছে হারের পর ১৪ই মার্চ তারা ধরাশায়ী হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশের কাছে।

দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দুর্দান্ত শুরু করেছে উদ্বোধনী ম্যাচে পোল্যান্ডকে হারিয়ে। ৬ লোনাসহ বাংলাদেশ ৭২-২৩ পয়েন্টে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে তুলে নেয় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় জয়। ম্যাচ সেরা হয়েছেন বাংলাদেশের মিজানুর রহমান।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর আমির হোসেন মালিতা

আফরোজা রুমা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আমির হোসেন মালিতা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৭শে জানুয়ারি তিনি ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

আমির হোসেন মালিতা ১৯৩৮ সালে ঝিনাইদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চননগর পাড়ার একজন বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম মহর আলী। তিনি ১৯৫৭ সালে ঝিনাইদহ উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৬০ সালে যশোর এম.এম কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাস করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আইন পেশায় যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আইন পেশার পাশাপাশি তিনি ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন।

আমির হোসেন মালিতা ছাত্রজীবনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্য ও আদর-ভালোবাসা পান। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন ও জানতেন। কারণ তাঁর বাবা বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের জন্য রাজপথে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি ঢাকাতে লেখাপড়ার সময় বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন ও সহচর হওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেলা কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কাজে তাঁর অবদান ছিল স্মরণীয়।

আমির হোসেন মালিতা ১৯৭০ সালে শাহীন ফিল্মের ব্যানারে *যে আগুনে পুড়ি* সিনেমা পরিচালনা করেন। এ সিনেমায় অভিনয় করেন– রাজ্জাক, কবরী, সুচন্দা, আনোয়ার হোসেন ও হাসমত। সিনেমাটি সে সময় সারা দেশে জনপ্রিয়তা পায়। এ সিনেমার একটি জনপ্রিয় গান– 'চোখ যে মনের কথা বলে...' আজও মানুষের মুখে মুখে।

মহান এ মানুষটি চিরতরে চলে যাওয়ার কারণে ঝিনাইদহসহ সারা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, যা পূরণ হবার নয়। তাঁর এই মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট গুণীজনেরা। মরহুম আমির হোসেন মালিতার পুত্র আনোয়ারুজ্জামান আজাদ চঞ্চল জানান, বাবার লেখা ও আত্মজীবনী পড়লে এ প্রজন্ম তাঁকে নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে ও অনুপ্রেরণা পাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর বাবার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মালিতার জানাজা ২৮শে জানুয়ারি ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজীর আলী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের জানাজা শেষে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, এক ছেলে এবং এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 09, March 2023, Tk. 25.00

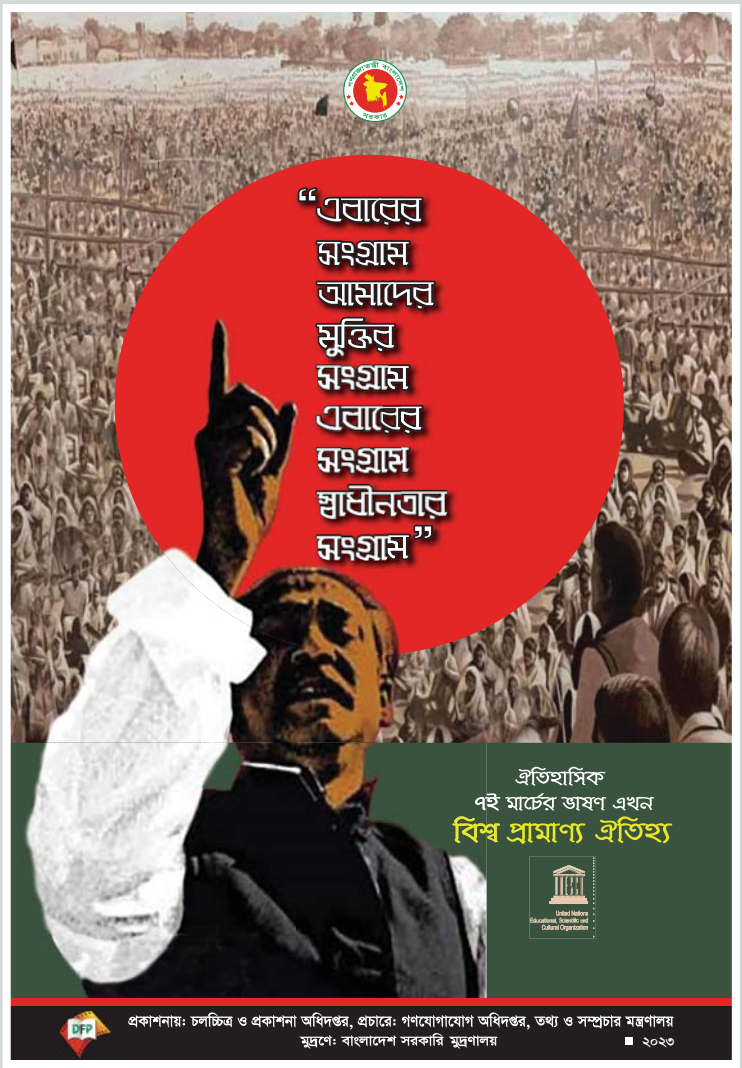

DFP

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd